সম্পূর্ণ উপন্যাস

বিশল্যকরণী

সমরেশ মজুমদার

সকাল ন'টায় হাকিমপাড়ায় অমল সোমের বাড়িতে গিয়ে অর্জুন অবাক হল। সুটকেস বন্ধ করে তাতে চাবি ঘুরিয়ে হাবু তাকে দেখে একগাল হাসল।

"কী ব্যাপার? সুটকেস নামিয়েছে কেন?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করতে হাবু আঙুল তুলে ভিতরটা দেখাল। মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। মাঝে-মাঝে অর্জুনের মনে হয় হাবু খুব বুদ্ধিমান। ও কথা বলতে পারে না

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

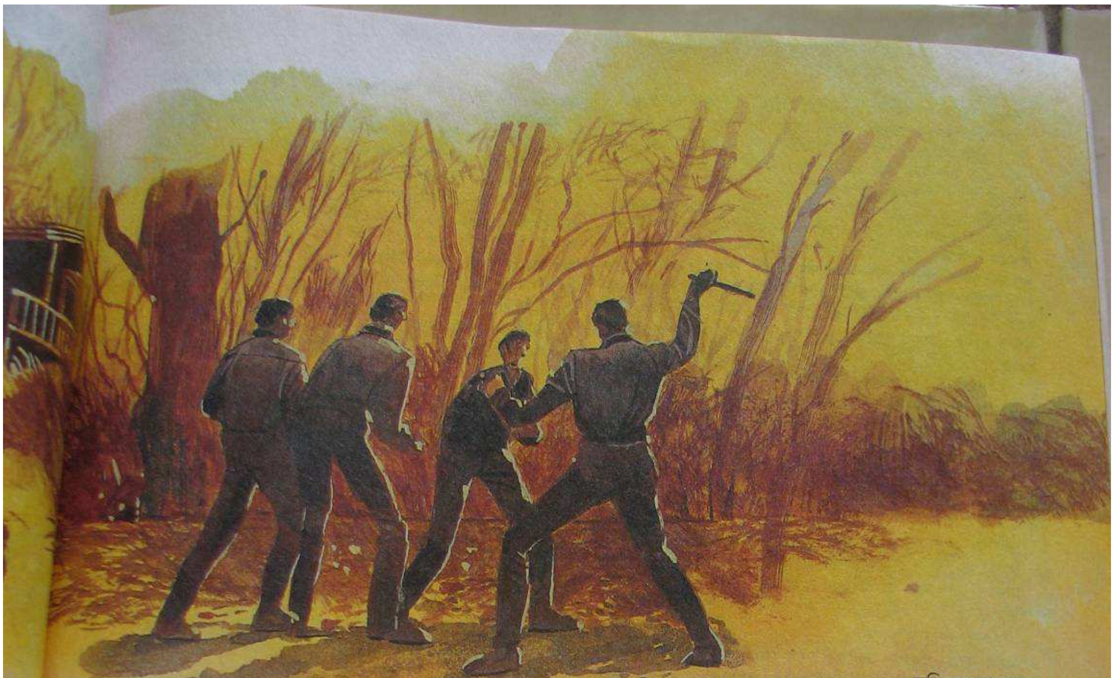

ছবি: অনুপ রায়

বলে কোনও আক্ষেপ নেই, উলটে বেশ উপভোগ করে। লোকে যখন ওর ইশারা বুঝতে পারে না, তখন মজা পায়।

"অমলদা কোথাও যাচ্ছেন?"

ডান হাত ওলটাল হাবু, যার অর্থ সে কিছুই জানে না।

বাড়ির ভিতরের বারান্দায় পৌঁছে অমল সোমকে দেখতে পেল অর্জুন। রোদ্দুরে চেয়ার পেতে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে বই পড়ছেন। বারান্দা থেকে সে একটা মোড়া তুলে উঠোনে ওঁর কাছাকাছি বসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?"

"ইন্টারেস্টিং!" অমল সোম বই বন্ধ করলেন, "বুঝলে অর্জুন, একটা লোক দু'-দু'বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেও তৃতীয়বার উত্তরমেরুতে যাচ্ছে। তৃতীয়বার ভাগ্য তার উপর সদয় না-ও হতে পারে জেনেও যাচ্ছে। কোনও ধনরত্ন পাওয়ার আগ্রহে নয়, শুধু ফোটো তোলার নেশা তাকে ঘরে থাকতে দিচ্ছে না।"

অর্জুন কথা বলল না। তার প্রশ্নটা অমল সোমের কানে ঢোকেনি। বই-এর মধ্যে এখনও বুঁদ হয়ে আছেন। অমল সোম বলে চলেছেন, "এরকম মানুষ আজও পৃথিবীতে আছেন বলে আজও একটার পর-একটা আবিষ্কার হয়ে চলেছে। বইটা পড়ে দেখো।"

একটা ইংরেজি পেপারব্যাক এগিয়ে দিলেন অমল সোম। অর্জুন বইটা নিয়ে দেখল মলাটে হিমবাহের ফোটো, উপরে লেখকের নাম রবার্ট মুরহেড, নীচে, 'পয়জনাস স্নো', বিষাক্ত বরফ। অর্জুন কল্পনা করল, উত্তরমেরুতে যখন ব্লিজার্ড বইছে, সাপের ছোবলের মতো বরফ ছুটে আসছে,তখন তাকে বিষাক্ত ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

অমলদা অর্জুনকে দেখলেন, "তুমি কি একেবারে তৈরি হয়ে এসেছ?"

"তৈরি হয়ে আসব কেন?" অর্জুন চোখ ছোট করল, "আপনি তো আমাকে কিছু বলেননি?"

"বলিনি? ঠিক বলছ তুমি? আমি তোমাকে বাইরে যাওয়ার কথা বলিনি?"

"না অমলদা। গত পরশু বিকেলে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি তখন বিশল্যকরণী পাতা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারেননি।"

চোখ বন্ধ করলেন অমল সোম। তারপর বললেন, "রোগটা ভালই পাকিয়েছে হে!"

"কী রোগ?"

"ভুলে যাওয়ার। আমি তোমাকে বলব বলে ঠিক করেছিলাম। তুমি এসেছিলে, চলেও গেলে। আজ সকালে আমার মনে হল, তোমাকে বলেছি এগারোটার মধ্যে চলে আসতে। আর মনে হওয়ামাত্র নিশ্চিত হয়ে গেলাম। যতদিন যাবে তত এই রোগ শক্তিশালী হবে। ধরো, দুপুরের খাবার খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে মনে হবে আমি খাইনি। এখনই বেশ কিছু মানুষের নাম আমি মনে রাখতে পারি না। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ একটা শঙ্খ বাজাতেন। গতকাল কিছুতেই সেই শঙ্খটার নাম মনে করতে পারছিলাম না। মনে না করতে পারলে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। তখন যে কী ভয়ানক কষ্ট!" অমল সোম বললেন।

"নামটা মনে করতে পেরেছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে। যত ভাবছি তত 'গজদন্ত' শব্দটা মনে আসছিল। শাঁখটার নাম কখনওই গজদন্ত নয়। ওই গজদন্ত শব্দটা থেকে গজেন নামটা মনে এল। বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ব্যস, পেয়ে গেলাম নামটা।"

অবাক হল অর্জুন, "কী করে?"

"গজেন্দ্রকুমারের একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'পাঞ্চজন্য'। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপর লেখা। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খটির নামে বইটির নামকরণ করেছিলেন।" হাসলেন অমল সোম।

"এটা হয়েই থাকে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাববেন না। এখন বলুন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হাবুকে দেখলাম সুটকেস গুছিয়ে ফেলেছে।" অর্জুন বলল।

"অনেকদিন উত্তরবাংলার গাছগাছালি দেখিনি। দিনদশেক আগে

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

মেজর ফোন করেছিলেন ফ্লোরিডা থেকে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'রামায়ণে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত থেকে যে ভেষজ পাতা আনতে গিয়ে খুঁজে না পেয়ে গোটা পর্বতটাকে তুলে নিয়ে এসেছিল, তার নাম কী?' বললাম। শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই গুল্ম কি এখনও পাওয়া যায়?' বললাম, 'পাওয়া যায় মানে? এই ডুয়ার্সের জঙ্গলে আগাছার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে!' শুনে তিনি খুব উত্তেজিত। দু'দিন পরে জানালেন, একজন ভেষজবিজ্ঞানীকে নিয়ে কলকাতা হয়ে এখানে আসছেন। ইতিমধ্যে ওঁরা দমদম বিমানবন্দরে নেমে গিয়েছেন। সাড়ে দশটায় বাগডোগরায় নামবেন। আমি ওঁদের নিয়ে আসতে গাড়ি পাঠিয়েছি। নেপালি ড্রাইভারকে মেজরের নাম লিখে প্ল্যাকার্ড করে দিয়েছি। ধরো, এগারোটার একটু পরে ওঁরা চলে আসবেন। এলেই ওঁদের গাড়িতে আমরা উঠে পড়ব।" অমল সোম শান্ত গলায় বললেন।

"কোথায় যাবেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আপাতত রাজাভাতখাওয়া। ওখানকার ফরেস্ট বাংলোয় তিনটে ঘরের জন্যে ডি এফ ও সাহেবকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু তুমি কী করবে এখন?"

অর্জুন চট করে ভেবে নিল। এখন প্রায় দশটা। সে উঠল, "আপনি যখন চাইছেন তখন চেষ্টা করছি ওই সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে আসতে।"

"এসো!"

বাড়িতে ঢোকামাত্র মা জিজ্ঞেস করলেন, "সাতসকালে কোথায় গিয়েছিলি?"

"অমলদার বাড়িতে। কেন?"

"এসব করে বেড়ালে চলবে? কবে থেকে বলছি একটা স্থায়ী চাকরির চেষ্টা কর, তুই কানেই তুলছিস না! কবে কখন একটা কেস পাবি, সেটা করে ঠিকঠাক রোজগারও সবসময় হয় না, এভাবে কতদিন চলবে?" মায়ের গলায় তীব্র বিরক্তি।

অর্জুন হাসল, "চলে তো যাচ্ছে। যা টাকা পেয়েছি তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি।"

"আমি ওসব জানি না। রায়সাহেব ফোন করেছিলেন, খুব জরুরি, বললেন। দয়া করে আজই ওঁকে ফোন কর।" মা বললেন।

"রায়সাহেব মানে?"

"ওঃ। মিস্টার এ পি রায়। কলকাতা থেকে একটু আগে ফোন করেছিলেন। বললেন, তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে।" মা চলে গেলেন তাঁর কাজে।

জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ এ পি রায়কে প্রথমে চিনত এস পি রায়ের ছেলে হিসেবে। এস পি রায়কে বলা হত 'ফাদার অফ জলপাইগুড়ি'। বেশ কয়েকটা চা-বাগানের মালিক এস পি রায় শহরের জন্যে, শহরের মানুষের জন্যে সারাজীবন কাজ করে গিয়েছেন। খেলাধুলো ভালবাসতেন ভদ্রলোক। নিজে ফুটবল খেলতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে মাঠে দেখা যেত। ভাল খেলতে পারলেই যে-কোনও খেলোয়াড়কে চাকরি দিতেন তিনি। কত গরিব মানুষ তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই এস পি রায়ের ছেলেও জলপাইগুড়ির খেলার জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অর্জুনকে বিশেষ স্নেহ করেন তিনি। তাঁদের চা-বাগানগুলো নানান সমস্যার কারণে হস্তান্তর করতে বাধ্য হওয়ায় তিনি এখন সপরিবার কলকাতায় বাস করছেন। এই মানুষটি হঠাৎ তাকে ফোন করতে গেলেন কেন? ঘড়ি দেখল সে। কথা বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ঠিক সময়ে পৌঁছনো তার অভ্যেস। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে টেলিফোনের বই দেখে নাম্বার বের করে ডায়াল করল অর্জুন। একটু পরেই এ পি রায়ের গলা শুনতে পেল সে, "হ্যালো!"

"এ পি-দা, আমি অর্জুন।"

"ও! শোনো, তুমি আজই ট্রেনে ওঠো। কাল কলকাতায় তোমাকে দরকার।"

"কেন?"

"কেন মানে? তোমার যা ট্যালেন্ট তা জলপাইগুড়িতে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মোটেই ভাবছ না। কলকাতার সবচেয়ে বড় বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা 'থার্ড আই'-এর এম ডি'র সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি তোমার নাম শুনেছেন। ওঁর সংস্থায় তুমি যদি জয়েন করতে চাও তা হলে সানন্দে গ্রহণ করবেন।" এ পি রায় বেশ খুশি গলায় কথাগুলো বললেন।

"এ পি-দা, আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। আমি এখনই একটা বিশেষ কাজে ডুয়ার্সে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আপনাকে ফোন করব।"

"যাওয়াটা কি খুব জরুরি?"

"আমি কথা দিয়েছি যে!"

"ওকে!"

ফোন রেখে দিলেন এ পি রায়, কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু কী করতে পারে সে? আচমকা কোনও সংস্থায় চাকরি নিয়ে সত্যসন্ধান করা কি তার পক্ষে সম্ভব? কোথাও চাকরি করলে নিজের স্বাধীনতা সংকুচিত হবেই। হয়তো প্রতি পদক্ষেপে কৈফিয়ত দিতে হবে। কিন্তু এ পি রায়ের প্রস্তাবে মুখের উপর না বলা যায় না। সে ঠিক করল, ফিরে এসে কলকাতা যাবে।

সে অমল সোম এবং মেজরের সঙ্গে ডুয়ার্সে যাচ্ছে এই খবরটা শুনে মা চট করে রাগারাগি করতে পারলেন না। অর্জুন মাকে আশ্বস্ত করল, ফিরে এসেই সে কলকাতা যাবে। মা শুধু বললেন, "এই সুযোগটা হারাস না অর্জুন!"

কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে অর্জুন যখন অমল সোমের বাড়িতে ঢুকল তখন ঘড়িতে সওয়া এগারোটা। অমল সোম বারান্দায় চেয়ারে বসে ছিলেন, পাশে হাবু। কাছে যাওয়ামাত্র হাতে ধরা ডালভরা পাতাগুলো এগিয়ে ধরলেন তিনি, "আমার বাড়ির বাগানে এগুলো জঙ্গল হয়ে রয়েছে। একেই যে বিশল্যকরণীপাতা বলে, তা তুমি

নিশ্চয়ই জানো। কিন্তু লক্ষ করে দ্যাখো, পাতাগুলো খুব ফ্যাকাসে। অর্থাৎ এর রস খুব পাতলা হবে। সেক্ষেত্রে সেটা আদৌ কার্যকর হবে কি না আমি জানি না।"

অর্জুন পাতাগুলো হাতে নিল। হ্যাঁ, এগুলো বিশল্যকরণী পাতা। কিন্তু জঙ্গলে যেরকম গাঢ় রঙের পাতা দেখা যায়, এগুলো তেমন নয়।

সে জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কি ওঁদের দেখাবেন?"

"ব্যাগে রেখে দাও। পার্থক্য বোঝাতে হলে দেখাব।" অমল সোম ঘড়ি দেখলেন, "কিন্তু এখনও ওঁরা আসছেন না কেন?"

"ফ্লাইট ঠিক সময়ে এসেছে কি না কে জানে! বাগডোগরায় নেমেও তো অনেকটা রাস্তা ওঁদের আসতে হবে।"

অর্জুন আসার পরে হাবু ভিতরে চলে গিয়েছিল। এবার একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ার আর বাস্কেটের মধ্যে দাঁড় করানো ছ'টা জলের বোতল নিয়ে এল।

"আমি বাইরের জল খেতে পারি না। এগুলো ফুরিয়ে গেলে কী হবে কে জানে? সিলকরা বোতলের জল কিনে খেলেও ঠিক ভরসা পাই না।" অমল সোম বললেন।

অর্জুন কিছু বলল না। বয়স হয়ে গেলে মানুষের ধ্যানধারণা বদলে যায়। যে অমল সোমের সঙ্গে সে বিভিন্ন অভিযানে গিয়ে দেখেছে, কোনও ব্যাপারেই তাঁর কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য নেই, তিনি এখন ফোটানো জল পাবেন না বলে দুশ্চিন্তায় আছেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে কি এমন একটা বয়স আসে, যখন তার খুঁতখুঁতুনি বেড়ে যায়!

শেষপর্যন্ত গাড়িটা বাড়ির সামনে এল বারোটা তিন মিনিটে। অর্জুন ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, গাড়ি থেকে নেমে দু'টো হাত পাখির ডানার মতো দু'পাশে মেলে চিৎকার করে উঠলেন মেজর, "হাই মধ্যম পাণ্ডব। আমি আশা করছিলাম নেমেই তোমাকে দেখতে পাব।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন?"

উত্তরটা মুখে না দিয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মেজর। তাঁর গালভর্তি দাড়ি অর্জুনের মুখে চেপে ধরে বললেন, "লা-টু উপ্পা।"

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির ভিতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের হাসি ভেসে এল।

মেজর সেদিকে তাকাতেই অমল সোমের গলা শোনা গেল, "দেরি হল কেন?"

মেজর বললেন, "দমদম থেকে ছাড়তেই দেরি করল। ইন্ডিয়ায় যা খুব স্বাভাবিক।"

অমল সোম গম্ভীর গলায় বললেন, "মেজর! প্লেনটা দেরি করলেও ছেড়েছে। আমেরিকার এয়ারপোর্টগুলোয় রোজ কত ফ্লাইট ক্যানসেল হয় তা নিশ্চয়ই আপনার জানা নেই। যাকগে, ছেড়েছিল বলে আমাদের দেখা হল!"

মেজর অমল সোমের দিকে হাত বাড়ালেন, "আপনি আগের মতো আছেন দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

এসময় উলটো দিকের দরজা খুলে যিনি নেমে এলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সিনেমার নায়িকা হতে পারতেন। শুধু লম্বাই নন, বেশ সুন্দরী। পরনে জিন্স আর জ্যাকেট। এগিয়ে এসে অমল সোমের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "স্টেফি মুরহেড।"

মেজর আলাপ করিয়ে দিলেন। স্টেফি ভেষজবিজ্ঞানী। মাস্টার্স করার পর রিসার্চ করছেন। থাকেন ফ্লোরিডায়। বয়স জেনে অর্জুন বুঝল, স্টেফি তার চেয়ে এক বছরের ছোট।

মেজরের ইচ্ছে ছিল কিছুক্ষণ অমল সোমের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে রওনা হওয়ার। কিন্তু অমল সোম বললেন, তাড়াতাড়ি রাজাভাতখাওয়ায় পৌঁছনো উচিত।

স্টেফিকে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসতে বলা হল। পিছনে ওঁরা তিনজন। অমল সোম ড্রাইভারকে বললেন, "ভানুপ্রসাদ, ট্যাঙ্ক ভরে তেল নিয়ে নাও।"

জলপাইগুড়ি শহর থেকে বেরিয়ে তিস্তা নদী পেরিয়ে বলেরো গাড়ি ছুটল ডুয়ার্সের দিকে। জানলার কাচ নামিয়ে একবুক শ্বাস নিয়ে মেজর বললেন, "আঃ!"

অমল সোম মুখ না ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

"বুকের ভিতরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল! কী বাতাস, একফোঁটা পলিউশন নেই। এখানে এলেই আমার বুকের ভিতরটা নির্মল হয়ে যায়।" মেজর বললেন।

"তা হলে এখানে না থেকে আমেরিকায় পড়ে আছেন কেন?"

"অভ্যেস! স্রেফ অভ্যেস। অসুস্থ হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাবে সরকার, শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার সুযোগ পাব।" মেজর বললেন, "কিন্তু খিদে পেয়ে গেল!"

"খিদে?" যেন এর চেয়ে শিশুসুলভ শব্দ অমল সোম আগে কখনও শোনেননি।

"অফকোর্স খিদে। সেই ভোরে হোটেল থেকে বেরোবার সময় এক কাপ চা ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। এয়ারপোর্টে বসে থাকতে হল। একটা ভাল রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল না। প্লেনে তো খাবার দেওয়ার বালাই ছিল না। আফটার অল এই চেহারাটা তো উইদআউট ফুয়েল রান করতে পারে না।" বেশ চেঁচিয়ে কথাগুলো বললেন মেজর।

অর্জুন বলল, "ডান দিকের বাইপাশ ধরলেই একটা ভাল ধাবা পাওয়া যেতে পারে।"

অমল সোম ঠোঁট ওলটালেন, "ধাবা! ওখানে খেলে আমাশা অনিবার্য।"

মেজর শরীর নাচালেন, "উঁহু। আমি বহুবছর আগে ধাবায় খেয়েছিলাম। মাটন চাপ, কী ডিলিসিয়াস! এখনও ভুলতে পারিনি।"

"মাটন চাপ! মেজর, আপনি এই বয়সে মাটন খাবেন? রেড মিট? আমি ভাবতে পারছি না আপনি আমেরিকায় থেকেও এত অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন কী করে?"

অর্জুন অমল সোমকে থামাতে বলল, "ওখানে চিকেনও পাওয়া যাবে।"

"চিকেন?" মেজর তাঁর কাঁচাপাকা দাড়িতে আঙুল চালালেন, "ওটা একটা খাদ্যদ্রব্য বলে আমি মনে করি না।"

স্টেফি অবাক চোখে চারপাশ দেখছিলেন। ওঁর হাতে এখন ক্যামেরা। জানলা দিয়ে টপাটপ ফোটো তুলে যাচ্ছেন একের পর-এক। ভানুপ্রসাদ সম্ভবত পিছনের আলোচনা শুনছিল। গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, "ধাবা এসে গিয়েছে, গাড়ি থামাব?"

"ইয়েস মাই বয়। মিস্টার সোম, এই ধাবায় যে খাবারকে আপনি স্বাস্থ্যসম্মত বলে মনে করেন, তাই আমি হাসিমুখে খেয়ে নেব।"

গাড়ি থামতেই একটা ছোকরা ছুটে এল। নামতা পড়ার মতো নানান খাবারের নাম বলে যেতে লাগল। গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন তাকে ধমকে চুপ করতে বলে মালিককে ডেকে আনতে বলল। ছেলেটার কথা শুনে একজন বেঁটে সর্দারজি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এখন ধাবার সামনে গাড়ির ভিড় হালকা। কয়েকজন খাটিয়ায় বসে খাচ্ছে। সর্দারজি সামনে এসে হাসল, "আরে বাপু! আপ? বলিয়ে বাবুজি?"

লোকটির নাম মগন সিংহ। এর আগে দু'-তিনবার এই ধাবায় নেমেছিল অর্জুন। একবার একটু ঝামেলাও হয়েছিল। দেখা গেল, তাকে মনে রেখেছে মগন সিংহ।

অর্জুন বলল, "ওই দাড়িওয়ালা সাহেব আর মেমসাহেব আজই বিদেশ থেকে এসেছেন। মশলা যতটা কম আর ঝাল একদম নয়, এমন খাবার দিতে পারবেন ওঁদের জন্যে?"

"জি। কেন পারব না? বসুন, বসুন! এ বাচ্চা, চার কুরশি লাগা জলদি।" চিৎকার করল মগন সিংহ। তারপর জিজ্ঞেস করল, "চিকেন না মাটন?"

অমল সোম খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "চিকেন! কিন্তু খাবারটা কী?"

"বাবুজি, সুপ দিতে পারি! যদি বলেন স্টু, তাও হবে। সঙ্গে রুটি, গরমাগরম।"

"আমাকে ভেজিটেবল সুপ দাও। ওদের চিকেন।"

মগন সিংহ অর্জুনের দিকে তাকাল, "বাবুজি, আপনিও তাই নেবেন?"

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

"না। মাটন চাপ আর রুটি। কিন্তু প্লেট চামচ যেন পরিষ্কার থাকে।"

মগন সিংহ চলে গেল। ছেলেটা ইতিমধ্যে চেয়ার পেতে দিয়েছিল। হাল্কা শীত মাখানো রোদ্দুরে এখানে বসতে মন্দ লাগবে না। ওপাশে মেজর স্টেফিকে বোধ হয় ডুয়ার্সের ভূগোল সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছিলেন। অর্জুনের ডাকে ওঁরা চলে এলেন। চেয়ারে বসে মেজর বললেন "গ্র্যান্ড! স্টেফি, এটাকে ওপেন এয়ার রেস্টুরেন্ট ভেবে নাও।"

কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন তিনি। স্টেফি চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কোনও লেডিসরুম নেই?"

মেজর চটপট ছেলেটিকে ডেকে বললেন, "অ্যাই, তোদের এখানে মেয়েদের টয়লেট আছে? টয়লেট? ওঃ! কী বলে বোঝাই!"

অর্জুন হাসল, "মেমসাহেবকে বাথরুমে নিয়ে যা।"

ছেলেটা মাথা নেড়ে ইশারা করল স্টেফিকে। মেজর বললেন, "উঃ, আমাদের কত ভুল কথা শোখানো হয়েছিল। বাথরুম যে স্নানের ঘর, জলবিয়োগের জন্যে নয়, তা কে বলবে?"

অমল সোম আরাম করে বসে ছিলেন। বললেন, "এত বছর আমেরিকায় থেকেও আপনি বিকল্প বাংলা চমৎকার বলছেন দেখে প্রীত হলাম।"

"মানে?" মেজর তাকালেন।

"বুঝে নিন।"

এই সময় লুঙি এবং পাঞ্জাবি পরা একটা স্বাস্থ্যবান লোক ধাবা থেকে বেরিয়ে এল পানীয়ের বোতল হাতে। এসে বোতল উঁচিয়ে ধরে গলায় খানিকটা ঢেলে চিৎকার করল, "মুন্না, এ মুন্না! জলদি বাহার আ।"

আর-একজন স্বাস্থ্যবান লোক বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। তারও হাতে পানীয়ের বোতল।

প্রথম লোকটি হতাশ গলায় বলল, "ফালতু বাত মত করনা।"

"একদম সাচ বাত। একটু আগে আমি দেখেছি। একজন মেমসাব। ফিল্মস্টার।"

"তো?" হাত ঘুরিয়ে মূকাভিনয় করে জিজ্ঞেস করল লোকটা, "কোথায় গেল?"

এই সময় দেখা গেল মগন সিংহ বেরিয়ে আসছে। দ্রুত লোকটার কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কিছু বলল। লোকটা সেটা শুনে অর্জুনদের দিকে তাকাল। তারপর সঙ্গীকে নিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। মগন সিংহ ভিতরে চলে যেতে অমল সোম বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখলে! এরকম সাবস্ট্যান্ডার্ড জায়গায় যারা খেতে আসে, তারা আর যাই হোক, ভদ্রলোক নয়। লুম্পেন, গুন্ডাদের জায়গা এটা। খাবার দিতে দেরি হলে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

অর্জুন বলল, "লোকটা বোধ হয় ট্রাক ড্রাইভার। মগন সিংহ যখন কথা বলেছে তখন আর ওর কিছু করার ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া এরকম লোক শুধু ধাবা কেন, অনেক বড়-বড় রেস্টুরেন্টেও চলে যায়। আপনি চিন্তা করবেন না।"

খাবার এল। একটা ছোট টেবিল পেতে তারপর খাবারের পাত্রগুলো রাখা হল। তিনজনের জন্যে পরিষ্কার চকচকে কাপ-উঁচু বাটিতে স্টু অথবা সুপ, একটা প্লেটে গরম রুটির স্তূপ, অর্জুনের জন্যে খালি প্লেট আর গরগরে মাটন চাপ।

অমল সোম বললেন, "দেখে তো শত্রু বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মহিলাটি কোথায় গেলেন? এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়।"

অর্জুন উঠে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ওদের দেখতে পেল। স্টেফির হাতে একটা গাছের ডাল। ছেলেটাও যেন ওকে কিছু পাইয়ে দিয়েছে এমন আনন্দে হাঁটছে। মুখোমুখি হতেই স্টেফি ডালটা দেখিয়ে বললেন, "তুমি এই গাছটাকে চেনো?"

"হ্যাঁ। গাঁদাফুলের গাছ।"

"দ্যাটস অল? তার বেশি জানো না? অথচ ও জানে। ও বলল যদি অল্প কেটে বা ছড়ে যায়, তা হলে এই গাছের পাতা থেঁতলে রসসুদ্ধ ক্ষতস্থানে চেপে দিলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়।" স্টেফি বলল,

"দ্যাখো, নেচার মানুষের জন্যে কতরকমের ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করে রেখেছে।"

"তা ঠিক। এরকম তুমি অনেক কিছু পাবে। কিন্তু খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

অর্জুনের কথায় তেমন কাজ হল না। চেয়ারে ফিরে এসে স্টেফি আবার সবিস্তার মেজরকে বোঝাতে লাগলেন গাঁদাগাছের পাতার কী মহিমা।

অমল সোম তখন খাওয়া শুরু করেছেন। বললেন, "গুড! ভেরি গুড।"

স্টেফি ছোট্ট পাতাভর্তি ডাল টেবিলের একপাশে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমি কি খুব সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশি এক্সসাইটেড হয়েছি?"

মেজর খেতে-খেতে বললেন, "নট দ্যাট। তোমার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এরা এসবে এত অভ্যস্ত যে, নতুন করে উত্তেজিত হতে পারে না।" একটু চুপ করে তিনি গলার স্বর পালটালেন, "অর্জুন!"

সবে মাংসের টুকরো রুটিতে জড়িয়ে মুখে পুরেছিল, সেই অবস্থায় তাকাল অর্জুন।

"আমি যদি তোমার খাবারটা একটু টেস্ট করতে চাই, জাস্ট একটা ওয়ান-ফোর্থ টুকরো, তুমি কি খুব আপত্তি করবে?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"না, নিন! আপনি তুলে নিন।" প্লেট এগিয়ে ধরল অর্জুন।

"মেজর, আপনি নিজের ক্ষতি করছেন। অর্জুনের যে বয়স তাতে সে রেড মিট, মশলা দেওয়া ঝাল রান্না খেয়ে হজম করতে পারে। আপনার বয়সে তা করা সম্ভব নয়। লোভ সংবরণ করুন যদি আরও কিছুদিন বাঁচতে চান।" বেশ অভিভাবকের গলায় কথাগুলো বললেন অমল সোম।

হতাশ চোখে অমল সোমকে দেখলেন মেজর। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়লেন, "আপনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে মিস্টার সোম।"

"স্বাভাবিক। প্রাণ থাকলেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।" অমল সোম মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিলেন।

ভানুপ্রসাদের কথা খেয়াল ছিল না কারও, অমল সোমই মনে করালেন। তাকে ভিতরে খেতে পাঠানো হল। খাওয়া শেষ করে অমল সোম স্টেফিকে জিজ্ঞেস করলেন, "মেজর টেলিফোনে তোমার কথা বলেছিলেন। এবার বলো, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এসেছ?"

স্টেফি খাওয়াটা উপভোগ করছিলেন। কাগজের রুমালে ঠোঁট মুছে বললেন, "আমি একজন ভেষজবিজ্ঞানী। মাস্টার্স করার পর কী নিয়ে রিসার্চ করব তা-ই ঠিক করতে পারছিলাম না। বস্টন ইউনিভার্সিটির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এডওয়ার্ড স্মিথ-এর সঙ্গে আচমকা পরিচয় হয়ে গেল। উনি আমাকে বললেন, ভারতীয় মহাকাব্যে এমন অনেক উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের শরীরে মিরাক্‌লের মতো কাজ করেছে। ছোটখাটো অসুখে তাদের অবদানের কথা এখন অনেকেই জানেন। উনি আমাকে বললেন যে, বুকের গভীর ক্ষত নাকি একটা লতানো গাছের পাতার রসে দ্রুত জুড়ে যায়। আমাকে একটি বই পড়তে দেন এডওয়ার্ড। ডিউরিং দ্য ওয়ার লছমন ওয়াজ অলমোস্ট কিল্‌ড বাই মেঘনাদ। সেটা ছিল সাম শর্ট অফ শেলের আঘাত। লছমন ওয়াজ সেন্সলেশ। তার বুক থেকে রক্ত বের হচ্ছিল এবং মৃত্যু যে-কোনও মুহূর্তেই হতে পারত। হিজ ওল্ডার ব্রাদার ওয়াজ টোল্ড দ্যাট, লছমনকে বাঁচাতে পারে একটা গাছের পাতার রস, যা গন্ধমাদন পাহাড়ে পাওয়া যায়। গাছটার নাম বিশল্যকরণী। যাই হোক, সেই পাতার রসে লছমনের উন্ড দ্রুত সেরে গিয়েছিল এবং সে বেঁচে গিয়েছিল। আমি এটাকে রূপকথা ভেবেছিলাম। অনেক অ্যাবসার্ড ব্যাপার রূপকথায় থাকে। কিন্তু এডওয়ার্ড আমাকে বললেন, ওই গাছ নাকি এখনও ইন্ডিয়ায় পাওয়া যায়।" শ্বাস নিলেন স্টেফি, "আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে এটা নিয়ে কথা বললাম। সবাই হেসে উড়িয়ে

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

দিল। একজন বিদ্রুপ করল এই বলে যে, যদি তুমি ওই গাছের পাতার রস ঠিকঠাক প্রিজার্ভ করতে পার, তা ওপেন হার্ট সার্জারির ক্ষেত্রে দারুণ কাজ দেবে। লোকটি বিদ্রুপ করলেও আমি একটা প্রস্তাব তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিলাম। আর তখনই মিস্টার মেজরের সঙ্গে আমার আলাপ হল। উনি ফোনে জেনে নিলেন যে, এখনও ইন্ডিয়ার এই পার্টে ওই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। আপনারা কেউ দেখেছেন কি?"

অমল সোম এবং অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

"গাছটা কি খুব দামি?"

অমল সোম বললেন, "নট অ্যাট অল। যে-কোনও বুনো গাছের মতো এখানে-ওখানে গজিয়ে থাকে। তবে তা দিয়ে ওপেন হার্ট সার্জারির কী কাজে লাগবে তা আমি জানি না।"

অর্জুন বলল, "ছেলেবেলায় খেলতে গিয়ে কোথাও কেটে গেলে বিশল্যকরণী পাতার রস লাগিয়ে দিলে দেখতাম, পরদিন জায়গাটা জুড়ে গিয়েছে।"

"তুমি সত্যি বলছ?" স্টেফি উত্তেজিত।

অমল সোম বললেন, "সেটা তো ওই গাঁদাফুলের পাতার রসেও জুড়ে যায়?"

অর্জুন বলল, "যায়। তবে বিশল্যকরণী আরও বেশি জোরালো।" অর্জুন পকেট থেকে অমল সোমের দেওয়া বিশল্যকরণী গাছের পাতা বের করল। "এই ছোট্ট ডালের পাতাগুলো হল বিশল্যকরণী। অমলদার বাড়িতেই এটি পাওয়া যায়।"

স্টেফি দ্রুত হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। মেজর বললেন, "আমার যতদূর মনে আছে, বিশল্যকরণী পাতা এমন ফ্যাকাসে হয় না। বেশ গাঢ় রং।"

অমল সোম বললেন, "ঠিক। গন্ধমাদন পাহাড়ে কী ধরনের বিশল্যকরণী গাছ ছিল তা আমি জানি না, কিন্তু এই ডুয়ার্সের জঙ্গলে ওই গাছের যে পাতা দেখেছি, তার রং খুব ডিপ, কালচে-নীল, আর তার পাতার রস খুব গাঢ়।"

স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি গাছ বললেন, কিন্তু আমি শুনেছি ওটা উদ্ভিদ।"

অমল সোম হাসলেন, "ঠিকই শুনেছ। আমরা অন্যমনস্কভাবে গাছ শব্দটি ব্যবহার করি। যেমন ধান। ধান একটি উদ্ভিদ। কিন্তু আমরা বলি ধানগাছ। বিশল্যকরণী লম্বায় দেড়-দু' ফুটের বেশি হয় না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "স্টেফি, এই পাতার রস কীভাবে ওপেন হার্ট সার্জারিতে কাজে লাগবে?"

"ওপেন হার্ট সার্জারির পরে যদি ওই পাতার রস, যেমন শুনেছি, তেমন কার্যকর হয়, তা হলে পেশেন্টের ওপেন করা শরীরের অংশ খুব দ্রুত জুড়ে যাবে। এখন চিকিৎসকরা যেভাবে জুড়ছেন তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগবে, খরচও কমে যাবে অনেক।"

"ওই রস কি পরীক্ষার মাধ্যমে অন্য চেহারায় নিয়ে যাওয়া হবে?"

"অফকোর্স। আমার এই উদ্যোগে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন একটি আন্তর্জাতিক ওষুধ সংস্থা। এই বাবদ যা খরচ হবে তা তাঁরা দিচ্ছেন। যদি সাফল্য পাওয়া যায় তা হলে আমি পেটেন্টবাবদ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হব।" স্টেফি হাসলেন।

হাসিমারা হয়ে রাজাভাতখাওয়া পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। রাজাভাতখাওয়া একটা জায়গার নাম জেনে স্টেফি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কথাটার মানে কী?"

অর্জুন বলল, "ভারত তখন অনেক ছোট-ছোট রাজ্যে বিভক্ত। এরকম এক রাজ্য কুচবিহার। আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি তা কুচবিহার রাজার রাজত্ব ছিল। এই রাজার সঙ্গে একসময় পাশের পাহাড়ি রাজ্য ভুটানের রাজার ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হলে শান্তিচুক্তি তৈরি করতে কুচবিহারের রাজা এবং ভুটানের রাজা অথবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি এই জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। সেই দুপুরে রাজা এখানে ভাত খেয়েছিলেন বলে জায়গাটার নাম হয়ে গেল 'রাজাভাতখাওয়া'।"

মাথা নাড়লেন স্টেফি, "এভাবে যে জায়গার নাম হতে পারে জানতাম না।"

সামনেই ট্রেন লাইন। স্টেফির কৌতূহল মেটাতে হল অর্জুনকে, "এই লাইন কুচবিহার হয়ে অসমে গিয়েছে। ওপাশে শুরু হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে।"

লাইন পেরিয়ে ডান দিকে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে তা শেষ হয়েছে জয়ন্তীর জঙ্গলে। বাঁ দিকের সরু পিচের পথটা ঢুকে গিয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এলাকায়। অমল সোম ভানুপ্রসাদকে সেদিকে যেতে বললেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে?"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "হুঁ।"

"বাঃ। বেশ কোয়াইট, যাকে বলে শান্ত নিরিবিলি জায়গা।" মেজর বললেন।

"আপনি দেখছি নিয়মিত বাংলা বই পড়ছেন।" অমল সোম বললেন।

মেজর রেগে গেলেন, "দেখুন মিস্টার সোম, আমার বাবা-মা চোদ্দো পুরুষ বাঙালি, আমিও তাই। অনেক-অনেক বছর আমেরিকায় আছি বলে চট করে ঠিকঠাক শব্দ মুখে আসে না, কিন্তু একটু ধাক্কা খেলেই গড়গড়িয়ে চলে আসে।"

একটি লোক রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে অমল সোম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "রেস্ট হাউস কোথায়? আমরা ঘর বুক করে এসেছি।"

"আপনারা ওই অফিসে যান। ওখান থেকেই চাবি পাবেন।" লোকটা যে বাড়িটা দেখাল, সেটা ছাড়িয়ে চলে এসেছিল গাড়ি। অতএব ভানুপ্রসাদকে ব্যাক করতে হল।

"আমার নামেই বুকিং আছে। অর্জুন, যাও, চাবি নিয়ে এসো।" অমল সোম বললেন।

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে অফিসঘরে ঢুকল। একজন টেলিফোনে কথা বলছেন, দ্বিতীয়জন মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন।

অর্জুন দ্বিতীয়জনকে বলল, "রেস্ট হাউসে বুকিং কে দেখেন?"

"বলুন।" কাগজ সরিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক।

"মিস্টার অমল সোমের নামে ঘর বুক করা আছে। উনি বাইরে গাড়িতে আছেন। তিনটি ঘরের বুকিং আছে।" অর্জুন বলল।

"আমি যদ্দুর জানি একটা ঘর খালি আছে, তিনটে তো নেই।"

"সে কী! উনি ডি এফ ও-কে বলেছিলেন তিনটে ঘরের জন্যে?"

"স্লিপ দিন।" হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক।

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাছে বুকিং স্লিপ আছে?"

অমল সোম জানলায় মুখ এনে বললেন, "টেলিফোনে কথা হয়েছে। ওটার দরকার নেই।"

ব্যাপারটা ঘরে ঢুকে বলতেই প্রথম লোকটি রিসিভার নামিয়ে খাতা খুলে দেখালেন, সেখানে অমল সোমের নাম নেই।

"কিন্তু ডি এফ ও ওঁকে কথা দিয়েছিলেন!" অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না।

"হয়তো, কিন্তু ওঁর অফিস আমাদের কোনও ইমফরমেশন পাঠায়নি। উনি আমাদের বস। উনি কিছু বললে আমরা শুনতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের উনি কিছু বলেননি।" প্রথমজন বললেন।

দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে বললেন, "একবার বড়বাবুকে ফোন করে দ্যাখো, ওঁকে কিছু বলেছেন কিনা। বললে অবশ্য বড়বাবু আমাদের জানাতেন।"

প্রথমজন ফোনের নাম্বার ঘোরালেন। রিসিভার নামিয়ে বললেন, "এখানে নাম্বার পাওয়া খুব মুশকিল। আপনারা ক'জন?"

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

"চারজন। একজন মহিলা।"

"দেখুন, দু'টো রুম দিতে পারি। একটা এখনই খালি আছে। দ্বিতীয়টা পাওয়া যাবে সন্ধের পরে। পার্টি ঘরে তালা দিয়ে ফরেস্টে বেড়াতে গিয়েছে। সন্ধের আগে ফিরবে না। গতকাল পর্যন্ত ওর বুকিং ছিল। আজ খালি পড়ে থাকায় ওকে দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, কারও বুকিং থাকলে ওকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে।" দ্বিতীয়জন বললেন।

"তার মানে দু'টো ঘর পাওয়া যেতে পারে, দ্বিতীয়টা সন্ধের পর।"

"হ্যাঁ।" প্রথমজন বললেন, "লাইন পেয়েছি, 'বড়বাবু, চারজনের এক পার্টি এসেছেন, বলছেন, ডি এফ ও সাহেব ওঁদের তিনটে রুম দিয়েছেন। আপনি কিছু জানেন? আরে! এ কথা বলবেন তো! রাখছি।" রিসিভার রেখে প্রথমজন বললেন, "আজ ওই দু'টোতে ম্যানেজ করে নিন, কাল দেখা যাবে।"

অর্জুন বলল, "আমরা চারজন। মহিলাকে একটা ঘর ছেড়ে দেওয়ার পর এক ঘরে তিনজন কি থাকা সম্ভব? তা ছাড়া আপনি বলছেন, দু'টোর একটা ঘর সন্ধের পর পাওয়া যাবে?"

"একটু কষ্ট করুন। এক্সট্রা বেড দিয়ে দেব সন্ধের পর। আমাদের কাছে খবর এলে এই সমস্যা হত না।" দ্বিতীয়জন বললেন।

"কিন্তু টেলিফোনে যাঁর সঙ্গে কথা বললেন তাঁর কাছে তো ইনফরমেশন ছিল!"

"তাঁর কাছে থাকলে হবে? ওটা তো এই অফিসে আসতে হবে। আসেনি। তা ছাড়া ডি এফ ও টেলিফোনে বলে দিলেন আর আপনারা কোনওরকম রসিদ হাতে না নিয়ে চলে এলেন? লিখিত অর্ডার ছাড়া আপনি আইনসম্মতভাবে ঘর ক্লেম করতে পারেন না।"

মাথা নাড়ল অর্জুন। কথাটা ভুল নয়। তবে এ দেশে সরকারি বড়কর্তাদের মুখের কথায় যত কাজ হয়, লিখিত অর্ডারে তা হয় না বলে সে এতকাল জানত।

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়াতে মেজর বললেন, "উঃ! এত সময় লাগল!"

অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকিয়ে সমস্যার কথা জানাল। অমল সোম বললেন, "অসম্ভব। মেজরের সঙ্গে একঘরে শুলে সারা রাত জেগে থাকতে হবে।" পকেট থেকে সেলফোন বের করে নাম্বার টিপলেন তিনি। কানে চেপে বিরক্ত হলেন, "যাঃ, বলছে, আউট অফ রিচ।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও হোটেল নেই এখানে?"

ইতিমধ্যে অফিস থেকে প্রথমজন বেরিয়ে এসেছিলেন। প্রশ্নটা তাঁকেই করল অর্জুন। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "না।"

মেজর বললেন, "রাজা এখানে ভাত খেয়েছিলেন অথচ হোটেল নেই?"

প্রথমজন কথাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ঠিক করলেন?"

অমল সোম বললেন, "এভাবে থাকতে আমি অভ্যস্ত নই।"

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন, "আপনারা এক কাজ করুন। সোজা জয়ন্তীতে চলে যান। ওখানে সরকারি বাংলো আছে, গেস্ট হাউসও হয়েছে কয়েকটা, সমস্যা হবে না।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কতদূর?"

"বেশি সময় লাগবে না।" ভদ্রলোক পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন, "মাঝপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মাটির রাস্তা ধরে গেলে জৈন্তী নদীর ধারে একটা বাংলো আছে। বেসরকারি। বছরের বেশিরভাগ সময় খালি থাকে। ব্যবস্থা সুন্দর। তবে সেখানে না যাওয়াই ভাল।"

মেজর সোজা হলেন, "কেন?"

"একদম নির্জন জায়গা তো? জঙ্গলের মধ্যে!" ভদ্রলোক চলে গেলেন।

মেজর বললেন, "লেট্স গো টু দ্যাট প্লেস।"

অমল সোম বললেন, "কী দরকার? জয়ন্তীর বাংলোটার খ্যাতি আছে। ওখানেই চলুন।"

এতক্ষণ স্টেফি তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মেজর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোন জায়গায় থাকতে চাও! লোকালয়ে, না জঙ্গলের মধ্যে?"

স্টেফি বললেন, "অফকোর্স জঙ্গলের মধ্যে।"

অর্জুন বলল, "একবার বাংলোটাকে দেখা যেতে পারে। পছন্দ না হলে জয়ন্তীতে চলে যাব। এর জন্যে খুব বেশি হলে মিনিট চল্লিশেক নষ্ট হতে পারে।"

গাড়ি ঘোরাল ভানুপ্রসাদ। অমল সোম বললেন, "চাল, ডাল, তেল, ডিম, আলু যা যা দরকার তা এখান থেকে কিনে নাও, মোমবাতিও। ওখানে গিয়ে আমি 'নেই' শুনতে রাজি নই।"

অধঘণ্টা পরে ডিকিতে যাবতীয় জিনিস বোঝাই করে ওঁরা রওনা হলেন। এখানে খুব তাজা সব্জি পাওয়া যায়, যা দেখে স্টেফি উচ্ছ্বসিত। মেজর গোটাচারেক মুরগি কিনে তাদের পায়ে দড়ি বেঁধে ডিকিতে রাখলেন।

এখন দুপুর শেষ। কিন্তু সন্ধে হতে ঢের দেরি। বিকেল আসব-আসব করছে। সুন্দর পিচের রাস্তাটা সোজা জঙ্গলের বুক চিরে চলে গিয়েছে। একটু-একটু করে ছায়া ঘন হচ্ছে। একবুক শ্বাস নিয়ে বাতাস ছাড়লেন মেজর, "আঃ। কী নির্মল জায়গা। নো পলিউশন। বুকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।"

খানিকটা যাওয়ার পর দু'টো বনমুরগিকে দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে যেতে দেখলেন ওঁরা। স্টেফি যখন জানলেন ওদের জীবনযাপনের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই, তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ওদের ধরা যায় না?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এই জঙ্গল সংরক্ষিত। কোনও প্রাণীকে ধরলে জেলে যেতে হবে।"

স্টেফি গম্ভীর হলেন। তারপর বললেন, "রাস্তা আর জঙ্গলের মধ্যে অনেক বুনো গুল্ম রয়েছে। ওদের মধ্যে বিশল্যকরণী দেখতে পেলে গাড়ি থামাতে বলো।"

প্রায় কুড়ি মিনিট ওরা ওপাশ থেকে একটা বাস আর তিনটে প্রাইভেট গাড়িকে এদিকে আসতে দেখল। জঙ্গল যত ঘন হচ্ছিল তত ঝিঁঝির ডাক বাড়ছিল। স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, "এই জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী আছে?"

"সব প্রাণী হিংস্র নয়! পরিস্থিতি তাকে হিংস্র করে দেয়। যেমন হাতি। হাতির মতো নিরীহ প্রাণী খুব কম আছে। কিন্তু খিদে পেলে অথবা আক্রান্ত হচ্ছে ভাবলে, সে এমন হিংস্র হয়ে ওঠে যে, তার মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। জঙ্গলে ঢোকার আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বোর্ডে যা দেখলাম, তাতে জানলাম, এই জঙ্গলে হাতি, লেপার্ড, শূকর, বাইসন ছাড়াও গন্ডার মাঝেমধ্যে দেখা যায়।" অমল সোম বললেন।

"আঃ! ইন্টারেস্টিং।"

"ভানুপ্রসাদ, দাঁড়াও।" বেশ জোরে বললেন অমল সোম।

অর্জুন তাঁর মুখের দিকে তাকাল। অমল সোম বললেন, "তোমরা সামনের দিকে তাকিয়ে আছ বলে সম্ভবত সাইনবোর্ডটা মিস করেছ। গাড়িটা ব্যাক করো ভানুপ্রসাদ।"

গাড়িটা প্রায় তিরিশগজ পিছিয়ে নিয়ে গেল ভানুপ্রসাদ। তখনই চোখে পড়ল একটা সরু রাস্তা ঢুকে গিয়েছে জঙ্গলের ভিতরে। রাস্তার মুখে গাছের গায়ে একটা কাঠের প্ল্যাকার্ড সাঁটা রয়েছে, যাতে লেখা, 'রেসটি'।

মেজর বললেন, "রেসটি! মানে কী?"

অমল সোম বললেন, "আমার অনুমান যিনি বাংলোটা বানিয়েছিলেন তিনি 'রেস্ট হাউস' না বলে আদর করে 'রেসটি' বলেছেন।"

অর্জুন বলল, "কিন্তু যেভাবে এবং যেখানে লিখে রাখা হয়েছে সেখানে কারও নজর তো চট করে যাবে না। তা হলে এভাবে লেখার মানে কী?"

অমল সোম বললেন, "হয়তো বাংলোটা যাঁর তিনি চান না বাইরের

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

লোক ভিড় জমাক।"

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল, "তা হলে আমাদের যাওয়াটা কি ঠিক হবে?"

"চলো, বাংলোটা চোখে দেখে আসি। লোকটাকে বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস বলে মনে হচ্ছে। নইলে এরকম নির্জন জঙ্গলে বাংলো তৈরি করতেন না। চলো।" মেজর বললেন।

অতএব পিচের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ঢুকল মাটির পথে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি মাঝে-মাঝে থার্ড গিয়ারে ছাড়া গতি বাড়াতে পারছে না। অজস্র পাখির ডাক ছাড়া বাঁদরের বাঁদরামিও চোখে পড়ল। সেই স্বল্প আলোতেও ফোটো তুলে যাচ্ছিলেন স্টেফি। আচমকা ব্রেক চাপল ভানুপ্রসাদ। থরথরিয়ে থেমে গেল বড় গাড়িটা। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

ভানুপ্রসাদ ইশারায় সামনের দিকটা দেখাল। গাড়ি থেকে কুড়ি ফুট দূরে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে লেজের উপর ভর করে সোজা যে দাঁড়িয়ে আছে, তার উচ্চতা অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট। শরীরটা দুলছে। মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গাড়িটাকে দেখছে।

"বিউটিফুল!" চাপা গলায় বলে স্টেফি ক্যামেরা তাক করলেন। তারপর উইন্ডস্ক্রিনের আড়াল থেকে ফোটো তুলে সন্তুষ্ট না হয়ে জানলার বাইরে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ফোটো তুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভানুপ্রসাদ দ্রুত তাঁকে টেনে নিয়ে এল ভিতরে। ঠিক তখনই সাপটি মুখ খুলে তীব্র গতিতে সামনে ছুড়ে ফেলল কিছু তরল পদার্থ। বলেরো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের উপরও এসে পড়ল কয়েক ফোঁটা। একবার শান্ত না হয়ে পরপর দু'বার তরল পদার্থ ছুড়ে যেন একটু হতাশ হল সাপটা।

"টেরিব্‌ল। ও কি বিষ ছুড়ছে?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

সাপটা ধীরে-ধীরে শরীর নীচে নামিয়ে নিল। তারপর সরসর করে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। অমল সোম স্টেফিকে বললেন, "স্টেফি, তোমার উচিত ভানুপ্রসাদকে ধন্যবাদ দেওয়া। সাপের থুতু তোমার গায়ে পড়লে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারত!"

স্টেফি ভানুপ্রসাদের হাতে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

ভানুপ্রসাদ একগাল হেসে গাড়ি চালু করল।

মেজর বললেন, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে এই জঙ্গলে মারাত্মক সাপ আছে। ঠিক এরকম সাপ আমি দেখেছিলাম আমাজনের ধারে।"

"আমাজন?" অর্জুন তাকাল।

"ইয়েস। অ্যানাকোন্ডার খোঁজে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ব্ল্যাক কোবরাদের জ্বালায় পালিয়ে আসতে হয়েছিল। আমাদের উচিত ছিল কয়েক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড নিয়ে আসা।" থেমে গেলেন মেজর।

কাছাকাছি কোথাও শব্দ হচ্ছিল। গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। ভানুপ্রসাদ নিচু গলায় বলল, "হাতি!"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এলিফ্যান্ট? কোথায়? আমি অবশ্য আফ্রিকার হাতির সঙ্গে মোকাবিলা করেছি। বিগ-বিগ এলিফ্যান্ট। তাদের তুলনায় তো ইন্ডিয়ান হাতি গোরুর মতো। কী বলো অর্জুন?"

অর্জুন বলল, "ইন্ডিয়ান বলে অবহেলা করবেন না।"

একটু পরেই একটা তারের দেওয়াল-ঘেরা জমির উপর দোতলা বাড়ি দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে। বাড়িটা কাঠের। বহুদিন রং না করায় একটু জীর্ণ ভাব এসে গিয়েছে। গেটের সামনে পৌঁছে হর্ন বাজাল ভানুপ্রসাদ।

তার আওয়াজে কিছু পাখি আশপাশের গাছ ছেড়ে প্রতিবাদ করতে-করতে ডানা মেলল। অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে তাকাল। হাওয়া বইছে বলে জঙ্গলে অদ্ভুত শব্দ বাজছে। কাঠের বাড়িটা নিঝুম হয়ে রয়েছে। সে দেখল, স্টেফিও গাড়ি থেকে নেমেছেন। পাশে এসে স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি সরকারি গেস্ট হাউস?"

মাথা নাড়ল অর্জুন, "না।"

"আমার মনে হচ্ছে ওখানে কেউ থাকে না।"

গাড়ির ভিতর থেকে অমল সোম বললেন, "একবার ভিতরে গিয়ে দেখে এসো।"

গেট খুলে ভিতরে ঢুকল অর্জুন। বাংলোর লনে এককালে বাগান ছিল, এখন অযত্নে সেগুলো প্রায় বুনো ঝোপ হয়ে গিয়েছে। ওপাশে বেশ কিছু কলাগাছে কলা ঝুলছে। পুরুষ্টু, পেকে হলদে হয়ে আসা কলাগুলো কী করে বাঁদরদের খাদ্য হয়নি এখনও কে জানে? হঠাৎ অদ্ভুত শব্দ হতেই অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। শব্দটা সমস্ত লন জুড়ে বাজছে। শব্দের উৎস লক্ষ করতে-করতে সে আবিষ্কার করল, প্রায় গোটা আটেক বড় গাছে টিন ঝুলছে। সেই টিনে ঘণ্টা বাঁধা আছে। প্রতিটি ঘণ্টা দড়ির সঙ্গে যুক্ত। সেই দড়ি ধরে টানলেই টিনে আওয়াজ হচ্ছে। যেমন বেজে উঠেছিল তেমন থেমে গেল শব্দ। লোকে কাকপক্ষী তাড়াবার জন্যে এরকম ঘণ্টা গাছে বেঁধে রাখে। ঘণ্টা যখন বাজল তখন নিশ্চয়ই কেউ দড়ি ধরে টেনেছে। যে টেনেছে সেই লোকটা কোথায়?

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

অর্জুন দু'টো হাত মুখের দু'পাশে এনে চিৎকার করল, "কেউ আছেন?"

কোনও উত্তর এল না। চারদিকে নজর রেখে সে বাড়ির পিছন দিকে আসতেই দু'টো ছোট ঘর দেখতে পেল। ঘরের দরজা ভিতর থেকে ভেজানো। মাথার উপর তাকিয়ে অর্জুন দেখতে পেল, ঘন্টাবাঁধা দড়ি ওই কাঠের ঘরের সিলিং-এর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। অর্থাৎ যে দড়িটা টেনেছে সে ওই ঘরেই রয়েছে।

অর্জুন দরজা ঠেলতেই ক্যাঁক শব্দ উঠল। ঘরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর লোকটাকে দেখতে পেল অর্জুন। একটা খাটিয়ার উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। দড়ির প্রান্ত খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে বাঁধা।

"শুনছেন?" অর্জুন ডাকল।

লোকটি মুখ থেকে কম্বলের আড়াল সরাল। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে বসল। অর্জুন দেখল লোকটির মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, দড়ি পাকানো শরীর, গায়ের রং বেশ কালো। মাথার চুলে বোধ হয় অনেকদিন কাঁচির ছোঁয়া লাগেনি।

ধীরে-ধীরে লোকটি খাটিয়া থেকে নামতে চেষ্টা করল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি অসুস্থ?"

"হ্যাঁ বাবু, বুখার। রোজ দুপুরে আসে, রাতের আগে ছেড়ে যায়।" লোকটি একটা লাঠি হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, "আপনি কে বাবু?"

"আমরা শুনেছিলাম এখানে থাকার জন্যে বাংলো আছে। তাই এসেছি।"

"মালিকের সঙ্গে কথা বলেছেন?"

"না। উনি কোথায় থাকেন?"

"শিলিগুড়িতে। মালিক না বললে দরজা খোলা নিষেধ আছে।"

"দেখুন, আমরা চারজন আছি। তার মধ্যে দু'জন এসেছেন বিদেশ থেকে। সন্ধেও হয়ে আসছে। এখন কোথায় গিয়ে থাকার জায়গা খুঁজব বলুন?" অর্জুন নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

"মালিক জানলে আমার চাকরি চলে যাবে। তা ছাড়া, তা ছাড়া এখানে না থাকাটা আপনাদের পক্ষে ভাল হবে বাবু! আপনারা জয়ন্তীতে চলে যান।"

"মালিকের সঙ্গে কথা বলা যায় না। ফোন নাম্বার আছে?"

লোকটি ঘরের একটা তাক থেকে খাতা বের করে খুলে এগিয়ে ধরল। অর্জুন পড়ল। ইংরেজিতে লেখা, সুধাংশুশেখর দত্ত, হসপিটাল পাড়া, শিলিগুড়ি। পাশে মোবাইল নাম্বার লেখা। পকেট থেকে সেলফোন বের করে নাম্বারগুলো টিপল সে। প্রথমবারে কোনও শব্দ হল না। দ্বিতীয়বারে পিপ্ পিপ্ আওয়াজ হতে-হতে শেষপর্যন্ত রিং শোনা গেল। একটু পরেই বেশ গম্ভীর গলায় একজন কথা বললেন, "কে?"

"নমস্কার। সুধাংশুশেখর দত্ত বলছেন?"

"বলছি।"

"আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকি। আজ আমরা চারজন বিশেষ কাজে রাজাভাতখাওয়ায় এসেছিলাম। আমাদের দু'জন আমেরিকা থেকে এসেছেন। কিন্তু ওখানে জায়গা না পেয়ে আপনার বাংলোয় পৌঁছেছি। মুশকিল হল, বাংলোর কেয়ারটেকার আপনার অনুমতি ছাড়া জায়গা দিতে পারবে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাই এই ফোন করছি।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। অর্জুন ভাবল লাইন কেটে গিয়েছে। সে বলল, "হ্যালো!"

"আপনি কী করেন?" ভদ্রলোক সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

"আমার পেশা সত্যসন্ধান করা।"

"সেটা কী জিনিস? ডিটেকটিভ?"

"আমি নিজেকে ডিটেকটিভ বলতে রাজি নই।"

"আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে ফোন করছি।" লাইন কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

অর্জুন দেখল, লোকটি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, "মালিক কী বললেন বাবু?"

"এখনও কিছু বলেননি। তবে বলবেন বোধ হয়।" অর্জুন অমল সোমদের ব্যাপারটা জানাতে এগোল।

লোকটি আসছিল পিছন-পিছন, "আমার কথা শুনুন। আপনারা এখনই চলে যান জয়ন্তীতে। ওখানে ঘর ঠিক পেয়ে যাবেন।"

"তোমার মালিক আপত্তি করলে তাই যেতে হবে।"

অর্জুন দেখল, ওঁরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে লনের ভিতরে চলে এসেছেন। মেজর মাথার উপর হাত তুলে চিৎকার করলেন, "মাই গড! কত পাখি! এখানে পাখিদের পাড়া নিশ্চয়ই আছে। এত পাখি যখন, তখন জল থাকতে বাধ্য।"

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "চলে যেতে হবে?"

"মালিককে ফোন করেছিলাম। তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানাবেন বলেছেন।"

স্টেফি চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এখানে কোনও বিশল্যকরণী দেখতে পেয়েছ?"

অর্জুন হাসল, "আগে থাকার জায়গাটার সমাধান হোক, তারপর তোমার জন্যে সমস্ত জঙ্গলে ওই পাতার খোঁজ করব। চিন্তা কোরো না।"

অমল সোম লোকটির দিকে তাকালেন, "তুমি কি কেয়ারটেকার?"

"হ্যাঁ বাবু। আমি এখানে থাকি। মালিকের নাম সুধাংশুশেখর দত্ত। শিলিগুড়িতে থাকেন।"

"মালিক কি প্রায়ই আসেন?"

"না। চার মাস আসেননি। এসে আমাকে কয়েক মাসের মাইনে দিয়ে যান। তখনই আলু, পিঁয়াজ, চাল, তেল কিনে রাখি। বাবু, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে এখানে পড়ে আছি। কিন্তু, ওই বাবুকেও বলেছি, আপনাদেরও বলি, এখানে না থেকে জয়ন্তীতে চলে যান।"

"কেন বলছ এ কথা?"

লোকটি মুখ নিচু করল, কোনও জবাব দিল না। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী নাম?"

"লছমন।"

এমন সময় অর্জুনের ফোন বেজে উঠল। সে সেলফোন অন করতেই ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, "দেখুন ভাই, আমি অজানা লোককে ওই বাংলোয় থাকতে দিই না। আপনার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানলাম, জলপাইগুড়িতে বেশ পরিচিত আপনি। কিন্তু আপনিই যে সেই অর্জুন তার প্রমাণ কী?"

"কী প্রমাণ চান?"

সঙ্গে-সঙ্গে হাত বাড়ালেন অমল সোম, "আমাকে দাও।"

সেলফোন হাতে নিয়ে অমল সোম বললেন, "সুধাংশু, আমি অমল সোম বলছি। পঁচিশ বছর আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।"

ওপাশের কথা শুনে অমল সোম হাসলেন, "আরে ভাই, ডি এফ ও-র কথা যে নীচের তলার মানুষের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছয় না, তা জানতাম না। তা অর্জুন সম্পর্কে কী প্রমাণ চাইছ?"

ওপাশ থেকে কিছু বলার পর অমল সোম লছমনকে ডাকলেন, "তোমার মালিক কথা বলবেন। ফোনটা নাও।"

লছমন সেলফোন কানে চেপে, "জি সাব, জি সাব," বলে আবার ফেরত দিল অমল সোমকে। সুধাংশুবাবুর কথা শুনে বললেন, "ও ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা সব কিনে এনেছি। শুধু তোমার লোক যদি রেঁধে দেয়। না পারলে উনুন আর বাসনকোসন দিলেই চলবে। ঠিক আছে, রাখছি।"

কোমর থেকে চাবি বের করে লছমন ধীরে-ধীরে দোতলায় উঠে ঘরের দরজা খুলতে লাগল। তিনটে শোওয়ার ঘর, একটা বসার। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে বাথরুম রয়েছে। অর্জুন দেখে নিয়ে বলল, "বাথরুমের জল কি নিচ থেকে আনতে হয়?"

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

"না বাবু।" লছমন মাথা নাড়ল, "পাম্প আছে। চালু করে দিচ্ছি।" তারপর বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, "বাবু, আমার শরীর এখনও ঠিক হয়নি। যা পারি তা রান্না করে দেব। আপনারা আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বেন।"

"রান্নাঘর কোথায়?"

"ওই ওপাশে। গ্যাস আছে। থালা, কড়াই ধোওয়া আছে।"

অর্জুন বারান্দায় চলে এসে চেঁচিয়ে ডাকল, "ভানুপ্রসাদ!"

গাড়ি থেকে নেমে এল ভানুপ্রসাদ, "বলুন!"

"গাড়ি ভিতরে ঢোকাও। সব জিনিসপত্র উপরে নিয়ে এসো। আচ্ছা, তুমি রাঁধতে জানো?"

"ওই, একরকম পারি।"

"ব্যস। তা হলেই হবে। লেগে পড়ো।"

এই সময় মেজরের উত্তেজিত চিৎকার কানে এল। অর্জুন দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল, দু'হাত মাথার উপর তুলে ভারী শরীর নিয়েও লাফাচ্ছেন মেজর, "হেভেন, হেভেন যদি কোথাও থাকে তা হলে তা এখানেই।"

"কোথায়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করার আগেই পিছন থেকে এসে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন। মেজর খোলা জানলার বাইরে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, "লুক।"

ওঁরা জানলার বাইরে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নীচে জঙ্গলের আড়াল থাকায় অর্জুন টের পায়নি। এখন দোতলার জানলা থেকে নদীটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চওড়ায় প্রায় একশো গজে জল বয়ে যাচ্ছে তরতরিয়ে। তারপর নুড়ি আর নুড়ি। শেষ হয়েছে একটা ছোট পাহাড়ের নীচে। বর্ষায় পুরোটাই যে ঢেকে যায় তাতে সন্দেহ নেই। এখন জল নিশ্চয়ই কম, হাঁটুর সামান্য উপরে গভীরতা। সেই জলে শেষ সূর্যের রোদ পড়ায় মায়াবী বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

অর্জুন বলল, "নিশ্চয়ই এই নদীর নাম জৈন্তী।"

"জয়ন্তী?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"স্থানীয় মানুষ বলে জৈন্তী। জয়ন্তীতে এই নদী অনেক চওড়া।"

"লেট্স গো। চলো, নদীর কাছে যাই।" মেজর উৎসাহী।

অর্জুন বলল, "রাত নামছে। এখন না বের হওয়াই ভাল। কাল সকালে বরং যাওয়া যেতে পারে। আর কিছু না হোক, যে সাপটাকে আসার সময় দেখলেন, তার আত্মীয়দের মুখোমুখি এখন হওয়া কি ঠিক হবে?"

"জানলাটা তা হলে বন্ধ করে দিই?"

নীচে পাম্প চালু হল। তার আওয়াজ খুবই কর্কশ। ভানুপ্রসাদ প্রত্যেকের লাগেজ উপরে রেখে গেল। একটু পরেই সে কিচেনের দখল নিয়ে নিল। অর্জুন চারটে ঘরে মোমবাতি জ্বেলে দিল।

ঠিক হল, একেবারে বাঁ দিকের শেষ ঘরে অমল সোম এবং অর্জুন রাত্রে থাকবেন। তাঁদের পাশের ঘরটি স্টেফির জন্যে। স্টেফির পাশের ঘরটি ড্রয়িংরুম। সেখানে রাত্রে থাকবে ভানুপ্রসাদ। ডান দিকের ঘরটিতে মেজর থাকবেন। তাঁর নাসিকাগর্জনের কারণেই একা থাকার ব্যবস্থা।

পোশাক পালটে বসার ঘরে এসে চারজন বসলেন। স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে হিংস্র জন্তুরা উঠে আসতে পারে?"

অমল সোম বললেন, "সাধারণত ওরা উপরে ওঠে না। গেট বন্ধ থাকলে ভিতরে ঢোকাও তো সম্ভব নয়। অবশ্য সাপ কী করবে তা বলতে পারছি না।"

"ওই লছমনকে জিজ্ঞেস করতে হবে কার্বলিক অ্যাসিড আছে কি না! আচ্ছা, লোকটি যে সেই চলে গেল, আর উপরে এল না তো! মনে হচ্ছে, আমরা আসায় ও খুশি নয়।"

স্টেফি দ্রুত মাথা নাড়লেন, "ঈশ্বর যেন এরকম ঘটনা না ঘটতে দেন।"

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেফি, তুমি কীভাবে রিসার্চটা শুরু করতে চাইছ?"

স্টেফি সোজা হলেন, "প্রথমত, আমাকে জানতে হবে ওই গাছের পাতার রসে সত্যি কোনও কাজ হয় কি না। যদি হয়, স্থানীয় মানুষরা নিশ্চয়ই প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আপনাদের দেখানো পাতা থেকে আন্দাজ করতে পারছি, ওই একই গাছের পাতা নানান রকমের হয়। হয়তো সবচেয়ে ঘন রস যা থেকে বের হয় তার কার্যকর শক্তি অনেক বেশি হবে। তা হলে সেই বিশেষ গাছ কোন মাটিতে জন্মায়, কী আবহাওয়া পছন্দ করে, তা জানতে হবে। ওই রসের স্যাম্পেল ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখব, কী কী উপাদান ওর মধ্যে আছে। সেসব উপাদানগুলো জানতে পারলে আমার পক্ষে আরও এগনো সম্ভব হবে।"

অমল সোম বললেন, "ধরো, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তুমি জানতে পারলে, ওর মধ্যে এমন উপাদান আছে যা ডেভেলপ করলে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিপ্লব ঘটতে পারে। তুমি যদি তার পেটেন্ট নিয়ে নাও, তা হলে ওষুধ কোম্পানিগুলো তোমাকে কোটি-কোটি ডলার অফার করবে। তাই না?"

স্টেফি হেসে উঠলেন, "ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার প্রথম কাজ ওই গাছের ঠিকঠাক পাতাগুলো খুঁজে বের করা।"

"তোমার ইউনিভার্সিটি এই রিসার্চের ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে?"

মাথা নাড়লেন স্টেফি, "নো। এই ধরনের প্রপোজাল তখনই অ্যাপ্রুভাল পায়, যখন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে গবেষণা করার জন্যে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করা হয়।"

মেজর আচমকা বলে উঠলেন, "ওটা কী পাখির ডাক?"

বাইরে তখন অন্ধকার নেমে গিয়েছে। মাঝে-মাঝেই ঘরে-ফেরা পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এইমাত্র যে ডাকটা কানে এল সেটা বেশ কর্কশ। মাথা নাড়লেন অমল সোম, "পরিচিত পাখি নয়। এই রকম জঙ্গলে কতরকমের পাখি আছে তার সার্ভে ঠিকঠাক হয়েছে কি না জানি না।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "দেখি, ভানুপ্রসাদ কী করছে?"

মেজর তার চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে নিজেও উঠলেন, "একটু দেখে আসি।"

"কী?" অমল সোম তাকালেন।

"ওই লছমন লোকটিকে আমার খুব সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। যে অত অসুস্থ, লাঠি হাতে হাঁটছে, সে দিব্যি সিঁড়ি ভেঙে উপরে এসে দরজা খুলে দিল। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমরা যাতে এখানে না থাকি তার চেষ্টা করছিল। সেই যে পাম্প চালাতে নীচে গিয়েছে আর পাত্তা নেই।" মেজরের কথা শেষ হওয়ামাত্র পাম্পের শব্দ থেমে গেল। মেজর দরজার দিকে এগোলেন।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "টর্চ আছে? ওটা সঙ্গে নিয়ে নীচে যান।"

মেজর হাসলেন, "ডুয়ার্সে আসছি বলে ওসব ব্যাপারে তৈরি হয়ে এসেছি। আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে ওটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।"

মেজর বেরিয়ে যেতে অমল সোম স্টেফির সঙ্গে গল্প করছিলেন। এই সময় ভানুপ্রসাদ তিনকাপ কফি নিয়ে এল।

অমল সোম হাসলেন, "বাঃ, গুড। বিস্কুট দিও তো। কিন্তু মেজর নীচে যাবেন বললেন। ওঁর কফিটা নিয়ে যাও।"

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে মেজর চারপাশে তাকালেন। এরকম কালো অন্ধকার তিনি এর আগেও অনেক দেখেছেন। এখন ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। হাওয়া জঙ্গলের শরীরে অদ্ভুত বাজনা বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণ কান পেতে থাকলে মনে অস্বস্তি জমে। নীচে টর্চের আলো ফেললেন মেজর। সাবধানে নীচে নেমে বাংলোর পিছন দিকে এগোলেন।

দূর থেকে একটা ঘরে আলো জ্বলতে দেখে মেজর বুঝলেন, ওখানে লছমন থাকে। অপদার্থ কেয়ারটেকার! বাংলোয় গেস্ট এলে ওর কর্তব্য তাদের যাতে অসুবিধে না হয় তা দেখা। অথচ লোকটা দরজা খুলেই গা-ঢাকা দিল। নিশ্চয়ই অন্য কোনও ধান্দা আছে ওর

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

অসুস্থতার ব্যাপারটা হয়তো ভান। বাংলোয় থাকার অনুমতি পাওয়ায় ওর নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে হবে।

মেজর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। ঘরে আসবাব বলতে একটা খাটিয়া আর কেরাসিন কাঠের ছোট আলমারি ছাড়া কিছু নেই। অসুস্থ লোকটির তো এখানে শুয়ে থাকার কথা।

মেজর দরজা থেকে ফিরতেই চমকে উঠলেন। কোনওরকমে তাঁর মুখ থেকে শব্দ বের হল, "হু হু?"

"আমি লছমন।"

সঙ্গে-সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে এল মেজরের। গলা চড়ল, "তুমি এই অন্ধকারে কী করছ?"

"কুছ নেহি।"

"কুছ নেহি? তো ভূতের মতন কোত্থেকে এলে?"

সঙ্গে-সঙ্গে জিভে একটা শব্দ তুলল লছমন, "ওই নামটা একদম মুখে আনবেন না সাহেব। ওঁরা হয়তো পছন্দ করবেন না।"

"ওরা মানে? কাদের কথা বলছ?"

হঠাৎ চুপ করে গেল। মেজর দেখলেন, লছমন সোজা ঘরে ঢুকে খাটিয়ার উপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

লোকটি রহস্যময়। মাথা নাড়লেন মেজর। এই সময় বেশ জোরে হাওয়া বইতেই জঙ্গলের ভিতরে প্রবল শব্দ শুরু হল। মেজর দ্রুত ফিরে এলেন উপরে। বসার ঘরে ঢুকতেই শুনলেন, অমল সোম বললেন, "না ভাই, আমি ভূত দেখিনি। যা দেখিনি তা আছে কি না কী করে বলব? তবে মানুষ মরে গিয়ে যদি ভূত হয়, তা হলে বাঘ, সিংহ, হাতি থেকে গোরু, ছাগল, পিঁপড়েরা মরে যাওয়ার পরে ভূত হবে না কেন?"

স্টেফি হেসে ফেললেন, "আমি বাঘের ভূতের গল্প পড়েছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, খ্রিস্টানরা নভেম্বর মাসের দু' তারিখ সন্ধেবেলায় বাড়ির সামনে লাউ ঝুলিয়ে 'অল সোল্‌স ডে' পালন করে।"

মেজর ঘরের ভিতরে এসে চেয়ারে বসে বললেন, "যা দ্যাখেননি তাই যদি অবিশ্বাসে থাকে, তা হলে তো আপনি ভগবানেও বিশ্বাস করেন না?"

মাথা নাড়লেন অমল সোম, "এ নিয়ে আমি তর্ক করব না।"

মেজর বললেন, "এই বাংলোটায় আমাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।"

স্টেফি তাকালেন মেজরের দিকে। উনি যাতে বোঝেন, তাই মেজর কথাগুলো ইংরেজিতে বলেছিলেন। অমল সোম বললেন, "সতর্ক হয়ে থাকা সবসময় ভাল।"

"আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। ওই যে লছমন লোকটিকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। বলল, অসুস্থ। ভানুপ্রসাদকে সাহায্য করা ওর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তা না করে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে যেভাবে তাকাল, যে-কেউ ভয় পেয়ে যাবে। আমি ধমকে বলেছিলাম, 'ভূতের মতো কোত্থেকে এলে?' তাতে কী বলল জানেন? বলল, 'ওই নামটা একদম মুখে আনবেন না সাহেব, ওঁরা পছন্দ করবেন না।' বলে শুয়ে পড়ল।"

পুরো সংলাপ ইংরেজিতে বলায় স্টেফি উত্তেজিত হলেন, "ফ্যান্টাস্টিক। ওর কথা সত্যি হলে এই বাংলোয় ভূত আছে। ওঃ, আজ রাত্রে আমি জীবনে প্রথমবার ভূত দেখব।"

রাত ন'টার মধ্যে মাংস-ভাত আর স্যালাড দিয়ে ডিনার শেষ হয়ে গেল ওঁদের। খাবার টেবিলে দিয়ে ভানুপ্রসাদ খেতে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে শব্দ হল। ভানুপ্রসাদ বারান্দায় যেতেই লছমন একটা থালা এগিয়ে দিল নিঃশব্দে।

সেটা নিয়ে ভিতরে ঢুকে সে অর্জুনকে বলল, "চৌকিদার খাবার চাইছে।"

"দিয়ে দাও।" অর্জুন বলল।

খেতে শুরু করে মেজর বললেন, "আমি হলে দিতাম না। নো ওয়ার্ক, নো ফুড। লোকটি ভয়ংকর রহস্যজনক।"

খাওয়া শেষ হলে ভানুপ্রসাদ এসে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেলে স্টেফি বললেন, "আচ্ছা, আমরা এখন অনেকক্ষণ ধরে জেগে গল্প করতে পারি না?"

মেজর বললেন, "নো ওয়ে। আমি খুব টায়ার্ড, শুলেই ঘুমিয়ে পড়ব।"

স্টেফি বিরক্ত হলেন, "প্লেন যতক্ষণ উড়ছিল ততক্ষণ আপনি ঘুমিয়েছেন। আমি যে বই পড়ে জেগে থাকব তারও উপায় নেই। এত কম আলো!"

অমল সোম বললেন, "তুমি যে জন্যে জাগতে চাইছ সেটা যদি সত্যি হয়, তা হলে জাগার দরকার নেই। এমনিই ঘুম ভেঙে যাবে।"

চারজন তিনটে ঘরে চলে গেলেন। ভানুপ্রসাদও মাঝের ঘরে শুয়ে পড়ল। অমল সোম তাঁর খাটে শুয়ে পড়ে বললেন, "হাওয়া না বইলে জঙ্গল কি ভয়ানক চুপচাপ হয়ে যায়, লক্ষ করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"গুড নাইট।" তিনি দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরলেন।

অর্জুনের এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল না। সে প্রায় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতেই জঙ্গলের ওপাশের আকাশে এক মায়াময় আলো দেখতে পেল। বড়-বড় গাছের ভিতরে গভীর কালো অন্ধকার। কিন্তু তাদের মাথা ডিঙিয়ে সেই আলো উঠছে আকাশে। বারান্দাটা এখন অন্ধকারে মোড়া। সবক'টা দরজা বন্ধ। অর্জুন নিঃশব্দে শেষ প্রান্তে চলে আসতেই মনে হল, ওই আলো গাছের মাথাগুলো ডিঙিয়ে ছড়িয়ে পড়ল এদিকে। কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ দেখা গেল দূর-আকাশে। আলো পড়তেই বাংলোর বাগান, গেট, এমনকী বারান্দার কিছু অংশ দৃশ্যমান হল। এই আলো নেহাতই নেতানো, কোনও তেজ নেই। আর তখনই মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল। অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল। বারান্দার শেষ প্রান্তে রাখা টুলটা টেনে নিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল।

ওপাশ থেকে বাতাস বইতেই অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। নিশ্চয়ই জঙ্গলে ফোটা কোনও ফুল। অবশ্যই একরাশ ফুল। দিকটা দেখে রাখল অর্জুন। কাল সকালে গিয়ে দেখতে হবে ফুলগুলোকে। জ্যোৎস্না ফুটতেই ঝিঁঝিরা ডেকে উঠেছিল। এখন যেন ওরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। যেন কে কত জোরে ডাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। অর্জুনের মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার লাইন, 'মায়ালোক হতে ছায়া তরণী।' এই সময় তার সামনের ভুবনকে মায়ালোক ছাড়া আর কী বলা যায়?

দেখতে-দেখতে একটা সময় চোখ বুজে এসেছিল, হঠাৎ চাপা গলার ধমক শুনে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল অর্জুন। গেট খোলা। কেউ একজন কাতর গলায় কিছু বলছে। তারপরেই তিনটে লোককে দেখতে পেল সে। পিছন থেকে দেখল বলে মুখ অদেখা রইল। তিনজন বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এবার লছমনকে দেখল সে। ধীরে-ধীরে এসে গেট বন্ধ করল। তারপর চোরের মতো বাংলোর দোতলার দিকে তাকাল। রেলিং-এর আড়ালে বসে থাকার জন্যে অর্জুনকে লক্ষ করল না। ফিরে গেল লছমন।

ব্যাপারটা বোধগম্য হল না অর্জুনের। এই লোক তিনটে কারা? কেন এত রাত্রে জঙ্গল ফুঁড়ে এখান এসেছিল? লছমনকে ধমকাচ্ছিল কেন? ওদের সামনে লছমন ক্ষমা-চাওয়া গলায় কথা বলছিল কেন? লছমন যে ওদের কাছে দুর্বল তা স্পষ্ট, কিন্তু কেন? ওরা আসবে বলেই কি লছমন ভূতের ভয় দেখাতে চেয়েছিল? বিকেলে যখন অর্জুন এখানে থাকার কথা বলেছিল, তখন খুশি হয়নি ও। বারবার চলে যাওয়ার কথা বলছিল। অর্জুন অনুমান করল, লছমনের এই কীর্তিকলাপের কথা ওর মালিক সুধাংশুশেখর দত্ত জানেন না।

আরও আধঘণ্টা বসে থেকে অর্জুন উঠে দাঁড়াল। এখন চাঁদের আলো একটু-একটু করে কমছে। জঙ্গলের ওপার থেকে কালচে মেঘের টুকরো ভেসে আসছে চাঁদের নীচে। আসামাত্র আলো প্রায় নিভে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মেঘ সরে দ্বিতীয়টি আসার মধ্যে যে সময়, তাতে

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

আবার আলো উজ্জ্বল হচ্ছে। অর্জুন নীচে নেমে এল। ঘাসের উপর পা রাখতেই একটা রাতের পাখি কর্কশ স্বরে এমন চিৎকার করল যে, হকচকিয়ে গেল সে। পাখিগুলো নিশ্চয়ই মানুষ চেনে। লছমন অথবা তিনটে লোককে দেখে ওই পাখি একবারও মুখ খোলেনি।

লছমনের ঘরে হ্যারিকেনের আলো একদম কমানো। যেন নিভে না যায় তেমনভাবে জ্বালানো। ঘরে লছমন নেই। কোথায় গেল লোকটি? অর্জুন চারপাশে তাকাল। ঘষা কাচের মতো জ্যোৎস্নায় গাছগুলো এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন জাতীয়সঙ্গীত শুনছে। সে ধীরে-ধীরে নদীর দিকে এগোতেই কানে শব্দটা এল। কেউ কাঁদছে। হয় কোনও বালক অথবা নারী। কান্নাটা কয়েক সেকেন্ড পরেই থেমে যাচ্ছে। আবার হচ্ছে। অর্জুনের মনে হল, এই কান্না কোনও মানুষের নয়। এই গভীর নির্জন জঙ্গলে মাঝরাতে কোনও মানুষ কেন এখানে এসে কাঁদবে? আসবেই বা কী করে? বিশেষ করে সে যদি নারী বা বালক হয়! প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এল সে। অমল সোম তখন গভীর ঘুমে।

অর্জুনের ঘুম ভেঙেছিল একটু দেরিতে। জানলা দিয়ে হাল্‌কা রোদ ঢুকছিল ঘরে। বাড়িতে থাকলে বিছানায় বেশিক্ষণ সে থাকতে পারে না ঘুম ভেঙে গেলে। এখানে মনে হল, আর-একটু আরাম করা যাক। সে পাশের খাটের দিকে তাকাল। ওটা শুধু খালি নয়, বেডকভার টানটান ছড়ানো। ওই দৃশ্য দেখার পর আর আরাম করা হল না। বাথরুমে গিয়ে তৈরি হয়ে নিল সে। তারপর বারমুডা আর টিশার্ট পরে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই দেখল, ভানুপ্রসাদ নীচের লনে গাড়ি মুছছে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "চা খাবেন সাহেব?"

"হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ। একটু আগে মেমসাহেব আর সোমসাহেব চা খেয়ে বেড়াতে গিয়েছেন।"

"ও।" মাথা নাড়ল অর্জুন, "দাও।"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল সে। এখন জঙ্গলের চেহারাই আলাদা। সোনা-সোনা রোদে ঝলমল করছে গাছের পাতা। বেড়াবার পক্ষে চমৎকার সময়। চা শেষ করে মেজরের ঘরের সামনে গেল অর্জুন। দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে করুণ ধ্বনি ভেসে আসছে। সারারাত ডেকে-ডেকে আর বোধ হয় মেজরের নাক তার শক্তি হারিয়েছে।

অর্জুন বাংলো থেকে নেমে নদীর দিকে যেতে-যেতে দেখল, লছমন লনের ঘাস কাটছে। চোখাচোখি হল। কিন্তু অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে নিল। লোকটির সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। বাংলোর পিছন থেকে নদীতে যাওয়ার কোনও বাঁধানো পথ নেই, কিন্তু যাওয়া-আসা থাকায় ঘাসের উপর দাগ পড়ে গিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড হাঁটতেই ওপাশে পাহাড় আর এদিকে নদী দেখতে পেল সে। নদী না বলে ঝরনা বলাই ভাল। দ্রুত বয়ে যাচ্ছে নুড়িপাথর সরিয়ে। জল হাঁটুর উপরে নয়। অর্জুন জলের গায়ে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড় সাইজের ব্যাঙ ডাঙা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জল ছিটকে উঠল একটু। অর্জুন একটা চ্যাপটা পাথর তুলে আড়াআড়ি ছুড়তেই সেটা জল চিরে-চিরে পৌঁছে গেল ওপারে। তারপরেই একটা চাপা আর্তনাদ কানে এল অর্জুনের। পাথরটা ঢুকে গিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। ওটা কি কারও গায়ে আঘাত করেছে? কৌতূহল হল। অর্জুন ঝরনা ডিঙিয়ে জঙ্গলের ওই অংশ দেখবে বলে পা বাড়াতেই পিছন থেকে গলা ভেসে এল, "যাবেন না বাবু!"

ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুন দেখল, লছমন দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। সে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন? নদীর ওপারে যেতে নিষেধ করছ কেন?"

"কোনও জানোয়ার আপনার ছোড়া পাথরে চোট পেয়েছে। চোট পাওয়া জানোয়ারকে বিশ্বাস করা যায় না। খুব ভয়ংকর হয়।" নির্বিকার মুখে বলল লছমন।

অর্জুন ওপারের জঙ্গলের দিকে তাকাল। কোনও শব্দ নেই। গাছ বা পাতারা এখন একটুও দুলছে না। অত ছোট পাথর যা জল ছুঁয়ে গিয়েছিল, তার আঘাতে এমন কোনও জোর থাকতেই পারে না যে, একটা জানোয়ার আহত হতে পারে!

"ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ তখন যাব না।" অর্জুন উপরে উঠে এসে লছমনের পাশে দাঁড়াল, "তুমি কতদিন আছ এখানে?"

চোখ বন্ধ করল লছমন। তারপর বলল, "বাইশ বছর।"

"অনেকদিন। এই রকম একা-একা থাকতে ভাল লাগে?"

পেটের উপর বাঁ হাত রাখল লছমন, "পেটের দায় বড় দায় বাবু!"

"হুঁ। তা তোমার এই বাংলোয় হিংস্র জানোয়াররা ঢুকে পড়ে?"

"বেড়া আছে বলে কেউ টপকায় না। তবে হাতিরা কয়েকবার বেড়া ভেঙে ঢুকেছিল।"

"তোমার কাছে বন্দুক নেই?"

"না।"

"কাল বিকেলে এতটা জঙ্গল ভেঙে আসতে আমাদের ভয় করছিল। রাত্রে কেউ নিশ্চয়ই এখানে আসবে না। আমি মানুষের কথা বলছি।"

"দরকার ছাড়া কেউ দিনেরবেলাতেই জঙ্গলে ঢোকে না। রাত্রে আসবে, প্রাণের ভয় নেই?" বেশ জোরে প্রশ্নটা করেই গলা নামাল লছমন, "বাবু, বাঘ, বাইসন, গন্ডার, হাতির সঙ্গে বুদ্ধি খরচ করে লড়াই করা যায়। হাজার হোক, ওরা জানোয়ার। মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে পারবে কেন? কিন্তু ওই দু'জনের কাছে বুদ্ধির কোনও মূল্য নেই। ওদের ভয়ে তো কাঁটা হয়ে থাকি। তবু, আমাকে তো বাইশ বছর ধরে দেখছেন ওঁরা। একসঙ্গে থাকি বলে হয়তো আমাকে দয়া করেন। কিন্তু আপনারা নতুন লোক, সেটাই তো আমার ভয়। তাই কাল বলেছিলাম, এখান থেকে চলে যেতে। আচ্ছা...!" চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল সে।

অর্জুন ডাকল, "দাঁড়াও। তুমি যে দু'জনের ভয় পাচ্ছ তারা কারা?"

লছমন মাথা নাড়ল, "আমি জানতাম আপনি এই প্রশ্নটা করবেন। কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।" সে মাথা উঁচু করে চারপাশে তাকাল। এখনও সূর্য গাছের আড়ালে। নদীর মাঝখানে রোদ পড়লেও এ পাশটা গাছের ছায়ায় ঢাকা। দমকা বাতাস বয়ে গেল। লছমন বলল, "এখন দিনেরবেলা। রাত হলে বলতাম না। মা মনসার আশীর্বাদ যাদের উপরে তারা মারতে চাইলে লৌহবাসরে ঢুকে লখীন্দরকেও মেরে আসে। জলে স্থলে গাছে ওরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। এই যে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার দশ হাত উপরে যে শাল গাছের ডালটা ঝুলছে, তা থেকে লাফিয়ে নেমে আপনার চাঁদিতে ছোবল মেরে যেতে পারে। টের পাওয়ার আগেই আপনি মরে যাবেন।"

"তুমি সাপ শব্দটা উচ্চারণ করছ না কেন?"

"মুখে নামটা আনতে নেই, তাই রাত্রে যখন হাঁটতে হয় তখন মনে-মনে 'অস্তি-অস্তি' বলি। অস্তি নাম যে উচ্চারণ করে তাকে ওরা কামড়ায় না।"

"বুঝলাম। দ্বিতীয়জন কে?"

"আপনারা শহরের মানুষ, বিশ্বাস করবেন না।"

"আমি বিশ্বাস যদি না-ও করি, তবু তোমার বিশ্বাসকে অসম্মান করব না।"

"এই জঙ্গলে তেনারা আছেন। আমি দু'জনকে জানি। নিশুতি রাত্রে ওই বাংলোর ছাদে পা ঝুলিয়ে বসেন। তবে আমার পরে তেনারা এসেছেন বলে, আমাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষ পড়লে তেনারা ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। ওই পনেরোদিন আমি বিকেল শেষ হলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে হরি নাম জপ করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়ি। ভুলেও ঘরের বাইরে যাই না।" কথা শেষ করে লোকটি উদাস পায়ে চলে গেল।

অর্জুন হাসল। আবার ভয় দেখাল লছমন। সে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারত, কাল রাত্রে কারা এসে ওর উপর রাগারাগি করছিল? কী করে ওরা রাত্রে এই জঙ্গলে ঢুকল?

প্রশ্নগুলো করাই যেত। কিন্তু লোকটিকে এত তাড়াতাড়ি কোণঠাসা

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এই সময় স্টেফির গলার হাসি শুনতে পেল অর্জুন। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল, বাড়ির সামনের গেটে স্টেফি আর অমল সোম দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। স্টেফির হাতে একগোছা পাতাসুদ্ধ লতা। সে গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, "পেয়েছ?"

"পেয়েছি। কিন্তু সোম বলছেন উনি সন্তুষ্ট নন।"

কাছে গিয়ে বিশল্যকরণী পাতাগুলোকে দেখল অর্জুন। পাতার রং তেমন গাঢ় নয়। সে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পেলেন?"

অমল সোম হাত তুলে জঙ্গলের একটা অংশ দেখালেন, "হাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ল। দশ-বারোটা লতা রয়ে গিয়েছে ওখানে। কিন্তু এগুলো আসল বিশল্যকরণী নয়। শরীরের কোথাও ছড়ে গেলে এর রসে কাজ হয় বটে, কিন্তু আসল বিশল্যকরণী মিরাক্‌ল করে।"

অর্জুন বলল, "এদের যখন পাওয়া গিয়েছে তখন তাদেরও পাওয়া যাবে।"

স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ওখানে তো অনেক বুনো গাছের ভিড়। তার মধ্যে এই ক'টা কী করে জন্মাবে?"

অমল সোম বললেন, "প্রকৃতির খেয়াল। কিন্তু অর্জুন, স্টেফি বেশ মার খেয়েছে।"

"মার খেয়েছে? কার কাছে?"

স্টেফির মুখে কপট রাগ ফুটল, "এত দুষ্টু বাঁদর আমি কখনও দেখিনি। যখন এই পাতাগুলো ছিঁড়ছিলাম, তখন ওরা গাছের ডালে বসে ফল ছুড়ে আমাকে মারছিল।"

ওঁরা কথা বলতে-বলতে বাংলোর সামনে চলে এসেছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে গলা ভেসে এল, "ওই চৌকিদারের কাছে ছাতা আছে কি না জিজ্ঞেস করুন না!"

ওঁরা উপরে তাকাতেই মেজর বারান্দার রেলিং-এ চলে এলেন। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "বৃষ্টির তো সম্ভাবনা নেই। ছাতি নিয়ে কী করবেন?"

"স্টেফির জন্যে ছাতা দরকার। ও যখন আবার জঙ্গলে ঢুকবে, তখন ছাতি খুলে রাখলে বাঁদরগুলো বোকা বনে যাবে।" মেজর হাসলেন।

স্টেফি ধমক দিলেন, "বোকা-বোকা কথা বলবেন না।" তারপর অমল সোমের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, "আমরা কখন ঠিক-পাতা খুঁজতে বের হব?"

"ব্রেকফাস্ট না করে আমি কোথাও বেরোচ্ছি না।" মেজর ঘোষণা করলেন দোতলায় দাঁড়িয়ে।

অমল সোম হেসে ফেললেন, "বেশ। তাই হোক।"

ব্রেকফাস্ট করতে-করতে আলোচনা হচ্ছিল, ভানুপ্রসাদ যদি ড্রাইভারি না করে রান্নার কাজ করত, তা হলে অনেক বেশি নাম করত। দুপুরের মেনু কী হবে জিজ্ঞেস করতে ভানুপ্রসাদ সলজ্জ হেসে বলল, "দেখি, ধরতে পারি কি না!"

"কী ধরবে তুমি?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"এসব নদীতে অনেক মাছ থাকে। কোনও একটা কায়দা করে ধরতে পারলে আপনাদের দুপুরবেলায় মাছ-ভাত খাওয়াব।" ভানুপ্রসাদ চলে গেল।

মেজর বললেন, "ইন্টারেস্টিং। ঢাল-তলোয়ার নেই তবু যুদ্ধ করতে চাইছে। না, আপনারা পাতা খুঁজতে যান, আমি ভানুপ্রসাদের সঙ্গে মাছ ধরব। সেই ছেলেবেলায় একবার ছিপ ফেলে পুঁটিমাছ ধরেছিলাম। বাই দ্য ওয়ে, এই নদীতে কী কী মাছ আছে?"

অমল সোম বললেন, "বেশিরভাগ মাছের এখনও নামকরণ হয়নি। ধরার পর আপনি নাম রাখতে পারেন। মৎস্য দফতরকে জানিয়ে দিলে ওরা রেকর্ড করে রাখবে।"

স্টেফি তৈরি হয়ে এলেন। জিনস, টিশার্ট, স্পোর্টস শু, মাথায় ক্যাপ। অমল সোমের পরনে সাদামাটা প্যান্ট-শার্ট। অর্জুন ইচ্ছে করেই হাফপ্যান্ট আর টিশার্ট পরেছে, পায়ে কেড্‌স। ওঁরা যখন গেটের দিকে এগোচ্ছিলেন তখন লছমন সামনে এসে দাঁড়াল, "কোথাও যাচ্ছেন আপনারা?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ।"

"বেশি দূরে যাবেন না। ওপাশের রাস্তায় চিতার টাটকা পায়ের ছাপ দেখে এলাম।"

"এই জঙ্গলে চিতা আছে?" অমল সোম ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ সাহেব। বড় বাঘ নেই, কিন্তু চিতা আছে।"

অর্জুন হাসল, "তা হলে তো দারুণ জায়গা! চিতা, সাপ, হাতি, বাইসন, গন্ডার থেকে শুরু করে সেই তেনারা এখানে বসবাস করেন।"

অমল সোমের কপালে ভাঁজ পড়ল, "তেনারা মানে?"

"যাঁরা রাতদুপুরে বাংলোর ছাদে পা ঝুলিয়ে বসে থাকেন।"

"রাবিশ!" অমল সোম হাঁটতে লাগলেন। ওঁরা সঙ্গী হলেন।

স্টেফি আগে জঙ্গলে ঢুকলেন। ডুয়ার্সের এই জঙ্গল সুন্দরবনের মতো অগম্য নয়। বৃষ্টি না হলে গাছের নীচের মাটি শুকনো থাকে। সমস্যা হয় বুনো ঝোপগুলো কাঁটাভর্তি ডালগুলো বুক বরাবর ছড়িয়ে রাখে। সেগুলো সরাতে ওঁরা গাছের ডাল ভেঙে লাঠি করে নিয়েছিলেন। তাই দিয়ে ডাল সরিয়ে হেঁটে নজর রাখছিলেন নীচে, বিশল্যকরণী পাতার খোঁজে। মাথার উপর বাঁদরগুলো সমানে চেঁচামেচি চালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কানে অদ্ভুত শব্দ ধাক্কা মারতেই অর্জুন হাত নেড়ে দু'জনকে থামতে বলল। অমল সোম শুনলেন। তারপর বললেন, "গাছ কাটা হচ্ছে। বেশি দূরে নয়।"

স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, "গাছ কাটছে কেন?"

অর্জুন বলল, "বুড়ো গাছ ঝড়ে পড়ে গেলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তা কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন গাছ কাটে তখন দূর থেকেই তাদের হইচই শোনা যায়। শুধু একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ছাড়া কোনও মানুষের গলা পাচ্ছি না। চোরা কাঠশিকারি নয় তো?"

অমল সোম বললেন, "চলো, নিঃশব্দে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি?"

ওঁরা যত এগোচ্ছিলেন তত আওয়াজটা বাড়ছিল। একটানা, ঘষঘষ আওয়াজ। আরও এগিয়ে যেতে ওদের দেখতে পাওয়া গেল। একটা মোটা মেহগনি গাছের প্রায় গোড়ায় যে করাত চালানো হচ্ছে, সেটা হাতে ব্যবহার করা হচ্ছে না। একটা ছোট জেনারেটারের সাহায্যে ওই বিদ্যুৎচালিত করাত চালানো হচ্ছে। সাধারণত চালু করলে জেনারেটার যে আওয়াজ তোলে, ওটা তা করছে না। সম্ভবত সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। পাঁচজন লোককে দেখা গেল। একজন তদারকি করছে, বাকি চারজন কাজে ব্যস্ত। এরা যে সরকারি কর্মচারী নয় তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারছিল না এই গভীর জঙ্গলের ভিতরে গাছ কেটে ওরা বাইরে নিয়ে যাবে কী করে? আশপাশে কোনও ট্রাক বা লরি চোখে পড়ল না। অর্জুন নিচু গলায় অমল সোমকে জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন?"

"ওদের কাছে অস্ত্র থাকবেই। মুখোমুখি হয়ে কোনও লাভ হবে না।"

হঠাৎ স্টেফি চিৎকার করে উঠলেন, "ওই যে, ওখানে। ওই গাছের নীচে।"

অর্জুন চকিতে দেখতে পেল, স্টেফি আঙুল তুলে কাছের একটা ঝোপ দেখাচ্ছেন, যেখানে বিশল্যকরণী জঙ্গল পেঁচিয়ে আছে। কিন্তু ওঁর গলার আওয়াজ পেয়ে গিয়েছে গাছকাটা লোকগুলো। সঙ্গে-সঙ্গে জেনারেটার থামিয়ে দিল একজন। বন্দুক বের করল দু'জন। সতর্ক ভঙ্গিতে আওয়াজটা কোন দিক থেকে এসেছে তা বোঝার চেষ্টা করছিল ওরা। ঠিক তখনই অমল সোম পকেট থেকে একটা হুইসল বের করে ঘনঘন বাজাতে লাগলেন। লোকগুলো পরস্পরের দিকে হকচকিয়ে তাকিয়েই ছোট জেনারেটার তুলে নিয়ে দৌড়তে লাগল উলটো দিকে। তারপরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল। শব্দটা চলে গেল দূরে।

অর্জুন হেসে ফেলল, "হুইসলটা কী ভেবে নিয়ে বেরিয়েছিলেন?"

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

অমল সোম হাসলেন, "এটা বাজিয়ে বাঁদর তাড়াব বলে ভেবেছিলাম। চলো, দেখা যাক!"

ওঁরা প্রায় কেটে ফেলা গাছটার কাছে গিয়ে ইলেকট্রিক করাতটাকে দেখতে পেলেন। তাড়াহুড়োয় ওরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। অমল সোম বললেন, "এই ঘটনার কথা ডি এফ ও-কে জানাতে হয়।" পকেট থেকে সেলফোন বের করে বোতাম টিপে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন, "লাইন পাওয়া যাবে।" অমল সোম ডি এফ ও-কে ফোন করে চোরা কাঠশিকারিদের কথা জানালেন। তাঁর বাঁশিকে পুলিশের বাঁশি ভেবে ওরা পালিয়েছে বটে, কিন্তু ফিরে আসতে দেরি করবে না। গাছটা ঠিক কোথায় তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

সেলফোন রেখে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "এই গাছটার দাম আন্দাজ করতে পার?"

"না।"

"অন্তত লাখ পাঁচেক হবে। এই যে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে ওরা গাছটা কাটতে চাইছিল, তা কখনওই সম্ভব হত না যদি লোকাল সরকারি কর্মচারীদের মৌন সম্মতি না থাকত। ডিএফ ও বললেন, আধঘন্টার মধ্যে লোকজন এখানে চলে আসবে। স্টেফি কোথায়?"

স্টেফিকে আশপাশে দেখা যাচ্ছিল না। ওঁরা সেই জায়গায় পৌঁছে দেখতে পেলেন, বুনো ঝোপের মধ্যে ঢুকে বিশল্যকরণীর পাতা ছিঁড়ে আর বেরোতে পারছেন না বুনো ডালের কাঁটায় আটকে গিয়ে। অমল সোম বললেন, "অভিমন্যুর মতো অবস্থা! যাও সাহায্য করো।"

বেশ সময় লাগল কাঁটা ছাড়িয়ে স্টেফিকে বের করে আনতে। ওঁর শরীরে বেশ কয়েকটি জায়গা ছড়ে গিয়েছে। কনুই-এর পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু ওসব নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে অমল সোমকে পাতাগুলো দেখালেন স্টেফি উত্তেজিত হয়ে, "দেখুন, এই পাতাগুলো আগেরগুলোর চেয়ে একটু বেশি গাঢ়।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "ঠিক। আমার মনে হয় এদিকেই সেই পাতাগুলোকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপাতত এটুকুই, চলো, ফিরে যাই।"

স্টেফি আপত্তি করলেন, "কেন? এখন তো সবে সাড়ে এগারোটা?"

"আমরা আবার বিকেলের আগে আসব। এখনই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবে। ওরা ওদের কাজ করুক, আমাদের দেখলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিব্রত করবে।"

অমল সোমের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেও স্টেফি তাঁকে অনুসরণ করলেন। ওঁদের পিছনে হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল, এই পাতাগুলো এখানে অবহেলায় পড়ে আছে অথচ এখানকার কেউ মাথা ঘামায়নি। কেন?

বারমুডা, গেঞ্জি, মাথায় টুপি পরে মেজর অনেকক্ষণ জলের ধারে দাঁড়িয়ে ভানুপ্রসাদের মাছধরা দেখছিলেন। শেষপর্যন্ত উত্তেজনা বাড়তে তিনিও জলে নেমে পড়লেন। বেশ স্রোত এবং ঠান্ডা জল। ভানুপ্রসাদ পাথর সরিয়ে জলের ধারাকে মূল স্রোত থেকে আলাদা করে দিতে চাইছিল, কিন্তু সক্ষম হচ্ছিল না। মেজর তার সঙ্গে হাত লাগালেন। একেবারে বালক হয়ে গেলেন তিনি। পাথরগুলোর খাঁজে বালি গুঁজে দেওয়ার পর জলস্রোত আলাদা হল। সেই স্রোত যেখান দিয়ে নেমে আবার মূল স্রোতে মিশে যাচ্ছে, সেখানে দু'পাশে দু'টো কাঠি পুঁতে তাতে কাপড় টাঙিয়ে দিল ভানুপ্রসাদ। সঙ্গে-সঙ্গে কাপড় ফুলেফেঁপে কাঠি উপড়ে দিল। তখন মেজর এগিয়ে গিয়ে কাপড়ের একপ্রান্ত ধরলেন চেপে, অন্য প্রান্ত ভানুপ্রসাদের হাতে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে একঝাঁক মাছ যেন আত্মহত্যা করতেই কাপড়ের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ল। ওঁরা দু'জনে একসঙ্গে কাপড়ের দুই প্রান্ত তুলে শুকনো নুড়িপাথরের উপর নিয়ে এসে দেখলেন, কড়ে আঙুল থেকে তর্জনীর সাইজের মাছ ভয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। ভানুপ্রসাদ

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

শুনে দেখল, ন'টা মাছ পাওয়া গিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক মাছকে কব্জা করে ভানুপ্রসাদ বলল, "এতেই হয়ে যাবে সাব। খুব মিঠা মাছ।"

কাপড়ে জড়িয়ে সে পারের দিকে হাঁটতে লাগল। এভাবে মাছ ধরার আনন্দ কখনও পাননি মেজর। এত তাড়াতাড়ি মাছ ধরার আনন্দ ফুরিয়ে যাওয়াটা পছন্দ হল না তাঁর। ইতিমধ্যে বারমুডা ভিজে গিয়েছে, গেঞ্জির খানিকটা। আরও কিছুক্ষণ জলে থাকতে ইচ্ছে হওয়ায় না ফিরে গিয়ে স্রোত ধরে হাঁটতে লাগলেন। জল ক্রমশ হাঁটু ছাড়িয়ে কোমরের কাছাকাছি চলে এল। মেজর বুঝলেন, এখন এর বেশি জল নদীতে নেই। হাঁটতে-হাঁটতে উলটো দিকে চলে গিয়েছিলেন মেজর। নুড়িপাথরের উপর খালি পায়ে হাঁটার যে মজা তা এই প্রথম পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা খরগোশের বাচ্চা মুখ নামিয়ে জল খাচ্ছে পারের প্রান্তে এসে। তিনি এগিয়ে যেতেই বাচ্চাটা ছুট লাগাল। বেচারা ভয়ে এমন কানা হয়ে গিয়েছিল যে, একটা বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ল কিছুটা। চারটে পা উপরে তুলে চিত হয়ে রইল একটু। তারপর আবার উলটে সোজা হয়ে টলতে-টলতে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। যেন একটা মজার খেলা পেয়েছেন এভাবে বাচ্চাটাকে অনুসরণ করলেন মেজর।

বাচ্চাটাকে আর দেখতে পেলেন না মেজর। কিন্তু যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির। ইটের উনুন, দু'টো হাঁড়ি, গোটানো বিছানা। বোঝাই যাচ্ছে এই জায়গা কোনও মানুষের সংসার। অথচ মানুষটা ধারেকাছে নেই। উপরে বড়-বড় পাতার গাছ যেন ছাউনি করে দাঁড়িয়ে আছে। যে এখানে থাকে সে নিশ্চয়ই তার থাকাটা গোপন রাখতে চায়! কিন্তু কেন? এই জঙ্গলের মধ্যে যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। বৃষ্টি নামলে পাতাগুলো যতই বড় হোক, কতক্ষণ তাকে শুকনো রাখতে পারবে! মেজরের মনে হল, লোকটা নির্ঘাত ক্রিমিনাল। পুলিশকে এড়িয়ে এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো পুলিশের খাতায় ওর নাম একজন ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে রয়েছে।

নদী পেরিয়ে এপারে চলে আসতেই লছমনের মুখোমুখি হলেন মেজর। লছমন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?"

"খরগোশ ধরতে। পারলাম না, পালিয়ে গেল।"

যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল লছমন। বলল, "ওদিকে যাবেন না সাহেব!"

"কেন?"

"পরশু একটা চিতা হরিণ মেরেছে ওখানে। ব্যাটা ওদিকটায় ঘোরাঘুরি করছে।"

রাগ হয়ে গেল মেজরের। এই লোকটিকে প্রথম থেকেই তিনি অপছন্দ করছেন। একদম মিথ্যে বলছে লোকটি। চিতা ঘুরলে ওখানে একটা লোক সংসার সাজিয়ে আছে কী করে? তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "লছমন, চিতা আমাকে কিছু বলবে না। ওরা মানুষ চেনে।"

"এ কী! একেবারে স্নান করে এলেন নাকি?" দোতলার বারান্দা থেকে অর্জুন চেঁচাল।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে মেজর বললেন, "মাছ ধরলাম ভানুপ্রসাদের সঙ্গে। দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"সাইজে ছোট কিন্তু খুব মিষ্টি মাছ।"

অমল সোম বসে ছিলেন চেয়ারে। বললেন, "মেজর ধরেছেন, নাম দাও 'মাইনর'।"

"মাইনর? নট ব্যাড। সাইজের সঙ্গে নামটা মিলছে।" মেজর বারান্দায় উঠে এসে চেয়ার টেনে বসে চিৎকার করলেন, "ভানুপ্রসাদ। কফি বানাও।" তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "একটা সন্দেহজনক ব্যাপার দেখে এলাম।"

ওঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখে হেসে ফেলল অর্জুন, "কীরকম?"

"ওই নদীর ওপারে কেউ লুকিয়ে থাকে। হয়তো আমাকে যেতে দেখে জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল লোকটা। রান্না করে খায়। হাঁড়ি, উনুন দেখে এলাম। সঙ্গে বিছানাও।" মেজর বললেন, "এখানে ভিখিরিদের আসার কোনও চান্স নেই। মনে হচ্ছে পুলিশের ভয়ে কোনও ক্রিমিনাল ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। আর এই ব্যাটা চৌকিদার জানে লোকটাকে।"

"কেন একথা মনে হচ্ছে আপনার?"

"ব্যাটা আমাকে বলল ওপারে না যেতে। ওখানে নাকি চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিতা ঘুরছে কিন্তু মানুষটাকে কিছু বলছে না? ভাবতে পার? মিস্টার সোম, আপনি পুলিশের বড়কর্তাদের খবরটা জানিয়ে দিন।" মেজর বললেন।

"কিন্তু আপনি তো লোকটাকে দ্যাখেননি?"

"না দেখিনি। তবে একজন যে ওখানে থাকে তাতে কোনও ভুল নেই। যেসব জিনিস ওখানে পড়ে আছে সেগুলোই প্রমাণ করছে।"

"কিন্তু পুলিশ এসে কাউকে না পেলে আমার উপর বিরক্ত হবে।" অমল সোম নির্বিকার মুখে কথাগুলো বললেন।

"ঠিক কোন জায়গায় জিনিসগুলোকে দেখতে পেয়েছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক ওপারে।"

"এদিক থেকে দেখলে কি বুনো ঝোপের আড়াল পড়বে?"

"একদম ঠিক।" মাথা নাড়লেন মেজর।

অর্জুন চিন্তা করল খানিক। তারপর অমল সোমকে বলল, "জায়গাটা একটু দেখে আসি। আমি জলে পাথর ছুড়েছিলাম। সেটা জঙ্গলে ঢুকে বোধ হয় কাউকে আঘাত করেছিল। একটা যন্ত্রণার শব্দ শুনেছিলাম।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেফি কোথায়?"

"ঘরে। ল্যাপটপ নিয়ে বসেছে।"

"পাতা খুঁজে পেয়েছে?"

"কাছাকাছি পাওয়া গিয়েছে। খোঁজাখুঁজি করলে পেয়ে যাব।"

নেমে এল অর্জুন। সে ইচ্ছে করেই নদীর দিকে না গিয়ে সামনের গেট খুলে জঙ্গলের এপাশে চলে এল। আড়চোখে তাকিয়ে বুঝতে পারল, লছমন বাংলোর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। মেজর ঠিকই বলেছেন, এই লোকটি সন্দেহজনক। সে বাংলোয় আসা-যাওয়ার পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

ডুয়ার্সের জঙ্গলের ভিতর একটা চমৎকার গা ছমছমে ব্যাপার আছে। ঝিঁঝির শব্দ, পাখির ডাক, বাঁদরগুলোর উল্লাস মিলেমিশে ছায়া জড়ানো বনের ভিতরটাকে যেন নাটকের মঞ্চ করে তোলে। মনে হয়, যে-কোনও মুহূর্তে নাটক শুরু হবে। একটা মোটা এবং শক্ত ডাল মাটিতে পড়ে আছে দেখে তুলে নিল অর্জুন। তারপর সেটা দিয়ে বুনো ঝোপের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে-সরিয়ে এগোতে লাগল। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসতেই সে অবাক হয়ে বকুল গাছটাকে দেখতে পেল। এই জঙ্গলের বড়সড় গাছগুলোর মধ্যে একটা মাঝারি বকুলগাছ একা দাঁড়িয়ে অজস্র ফুল ঝরিয়ে দিয়েছে নীচের মাটিতে। তারই সুগন্ধে চারপাশ ম-ম করছে।

মিনিটদশেক পরে অর্জুনের খেয়াল হল, সে একটাও বিশল্যকরণী গাছ দেখতে পায়নি। এরকম হওয়ার কথা নয়। ডুয়ার্সের জঙ্গলে অযত্নেও বেশ পুরুষ্টু হয়ে ওরা ছড়িয়ে থাকে। তা ছাড়া অমলদার ভুল হওয়ার কথা নয়। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ কানে এল। একাধিক গাড়ি ওপাশের জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই অমল সোমের ফোন পেয়ে ডি এফ ও লোকজন পাঠিয়েছেন। সে দিক পালটে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। একটা বিরাট পাইথন মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। মাঝারি আকারের হরিণকে অর্ধেক গিলে ফেললেও মুখটাকে গিলতে পারছে না বড় শিং দু'টোর জন্যে। হরিণের মাথা শিং সমেত বাইরে রয়ে গিয়েছে। শিং দু'টো এত বড় যে, পাইথনের পক্ষে তা গিলে ফেলা সম্ভব নয়। যতটা সম্ভব মুখের হাঁ বাড়িয়েও যখন কাজ হচ্ছে না, তখন ধীরে-ধীরে লেজটাকে মুখের কাছে নিয়ে এসে তা দিয়ে শিং দু'টোর একটাকে জড়িয়ে ধরে চাপ

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

দিতে লাগল সাপটা। মিনিট খানেকের মধ্যে একটা শিং মট করে ভেঙে যেতেই মুখের অর্ধেকটা গিলে ফেলল পাইথন। হরিণের শরীর ওর মুখের ভিতরে আটকে থাকায় সাপটার আক্রমণ করার ক্ষমতা এখন নেই। অবশ্য একই উপায়ে দ্বিতীয় শিং ভেঙে ফেলে আস্ত হরিণটাকে পেটে চালান করে কয়েকদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোবে পাইথনটা। অর্জুন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। এই সময় শুকনো পাতায় শব্দ তুলে দু'টো শিয়ালের চেয়ে বড় প্রাণীর উদয় হল। এরা নির্ঘাত নেকড়ে। কয়েক সেকেন্ড সাপটাকে দেখে নিয়ে দু'জনে দু'পাশে গিয়ে শরীরের মাঝখানে কামড়ে মাংস ছেঁড়ার চেষ্টা করল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল শক্তিতে শরীর মোচড়াল পাইথন। দ্রুত লেজ ঝাপটে এমন আঘাত করল যে, একটা নেকড়ে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে আর উঠল না। দ্বিতীয় নেকড়ে প্রাণ বাঁচাতে পড়ি কি মরি করে ছুটল যেদিকে পারে।

অর্জুন আর দাঁড়াল না। লাঠিটাকে নিয়ে ও নদীর অনেকটা উপরে চলে এল। এখানে জল বেশি নয় কিন্তু স্রোত প্রচুর। লাঠি থাকায় নদী পার হওয়া সহজ হল।

নদীকে খানিকটা তফাতে রেখে গাছের আড়ালে-আড়ালে নীচের দিকে নামতে লাগল অর্জুন। এপার থেকে বাংলোর ছাদ দেখা যাচ্ছে। রোদ পড়ায় চকচক করছে। মেজর যে জায়গাটার কথা বলেছিলেন, তার কাছাকাছি এসে নিঃশব্দে ডালপালা সরিয়ে সে এগোল। মিনিট তিনেক পরে সে শক্ত হল। মানুষের গলা। বেশ চাপা। সে নিচু হয়ে আর-একটু এগোতেই স্থির হয়ে গেল। বুনো ঝোপে নিশ্চিন্তে ছিল ওটা, মানুষ দেখে সোজা হয়ে ফণা তুলেছে। দূরত্ব এত কম যে, ছোবল মারলেই তার মুখে আঘাত লাগবে। আর মুখে বিষ ঢুকলে মৃত্যু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। অর্জুন নড়ল না। পাথরের মূর্তির মতো সাপের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সাপটা দুলছে। ফণাটা এপাশ-ওপাশ করছে। কী সাপ জানার দরকার নেই। কিন্তু ওটা যে বিষধর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লাঠিটা পায়ের পাশে মুঠোয় ধরা। ওটা তুলতে গেলেই ছোবল নেমে আসবে। সাপটা এই মুহূর্তে মনঃস্থির করতে পারছে না।

হঠাৎ ওপাশের মানুষটির গলা চড়ল, "তুই এখান থেকে চলে যা। পাহাড় পেরিয়ে ভুটানে ঢুকে যা। আমি বলছি, তুই এখানে থাকিস না!"

গলার স্বর সাপটাও শুনতে পেয়েছিল, তাই মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে কথাগুলো এসেছিল সেদিকে তাকাল। তারপর ধীরে-ধীরে ফণা নামিয়ে বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল নিঃশব্দে। কয়েক সেকেন্ড লাগল অর্জুনের ধাতস্থ হতে। এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে এর আগে হয়নি।

মিনিটদুয়েক পরে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুন বুঝতে পারল কেউ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে ধীরে-ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, লছমন নদী পার হচ্ছে। অর্থাৎ লোকটা কাউকে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে বাংলোয়। অর্জুন লাঠিটা শক্ত করে ধরে এগোল। শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, একচিলতে পরিষ্কার জায়গায় পাথরের ভিতর শুকনো ডাল গুঁজে উনুন ধরাবার চেষ্টা করছে একটা লোক। পরনে ময়লা পাজামা আর গেঞ্জি। লোকটা আকাশের দিকে তাকালে বোঝা গেল ওর মুখ দাড়িতে ঢাকা।

ডালপালা সরিয়ে লোকটার পিছনে পৌঁছে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে খানিকটা দূরে গিয়ে একটা ধারালো কাটারি হাতে তুলে নিয়ে লোকটা আক্রমণের ভঙ্গিতে উবু হয়ে বসল।

"ওসব করে কোনও লাভ নেই। আমি তোমার শত্রু নই। কে তুমি?"

"আপনি কে? এখানে কী করে এলেন?"

"ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলাম। ওই বাংলোয় বেড়াতে এসেছি।"

লোকটা তাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, "লছমন আপনাদের কথা বলছিল। আমি কে জেনে আপনার কোনও লাভ নেই।"

"আমার লাভ না থাকলেও তোমার লাভ হতে পারে।" অর্জুন হাসল।

"মানে?"

"কাল রাত্রে কয়েকজন লছমনকে শাসিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ওরা তোমার খোঁজে এসেছিল। একটু চাপ বাড়লেই লছমন তোমাকে ধরিয়ে দেবে।"

লোকটা অদ্ভুত চোখে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "সত্যি কথা বলুন তো, আপনি কে?"

"একটু আগে তো বললাম, এখানে বেড়াতে এসেছি।" অর্জুন হাসল, "কিন্তু তুমি এভাবে জঙ্গলে লুকিয়ে আছ কেন? থাকার পক্ষে জায়গাটা নিরাপদ নয়। বাঘ, হাতির কথা ছেড়ে দিলাম, চারপাশে মারাত্মক বিষধর সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটাকে তো ওখানে দেখলাম।"

লোকটা মাথা নাড়ল, "কিন্তু কোথায় যাব? লছমন বলছে ওই পাহাড়ের ওপারে ভুটানে চলে যেতে। কিন্তু ভুটান তো আরও খারাপ জায়গা। ওখানকার পুলিশ অচেনা লোককে জঙ্গলে দেখলেই মেরে ফেলে। তা ছাড়া খাবারও পাব না। এরকম জঙ্গলে খাওয়া যায় এমন ফল দেখিনি।"

"খুব খারাপ সমস্যায় পড়েছ হে! তুমি কি পুলিশের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছ?"

"শুধু পুলিশ? ওরাও আমার মৃত্যু চায়।"

"কারা?"

লোকটা আবার তাকাল, "এসব জেনে আপনার কী লাভ? আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।"

"ঠিক আছে। তুমি যখন নিজের মৃত্যু চাইছ তখন তাই হোক।"

"মৃত্যু? আমি সেটা কখন চাইলাম?"

"তা হলে আমি যা বলব তা তুমি শুনবে?"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে লোকটা বলল, "শুনি।"

"তুমি ওইসব রান্না শেষ করে খেয়েদেয়ে এই জায়গাটা ছেড়ে দেবে। ইচ্ছে করলে নদী বরাবর গিয়ে অনেকটা উঁচুতে ডেরা বাঁধতে পার। যদি কেউ বা কারা তোমার খোঁজে এখানে আসে, তা হলে তারা না পেয়ে হতাশ হবে। যাওয়ার আগে তুমি থাকার জন্য ওখানে যেসব চিহ্ন রয়েছে তা ভাল করে মুছে দিয়ে যাবে।" অর্জুন বলল।

"এই জঙ্গলের কোথাও গিয়ে স্বস্তি পাব না। কাল রাত্রে যারা লছমনের কাছে এসেছিল তারাও তো জঙ্গলের ওপাশে নজর রাখছে। তারাও তো ওইদিকে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকটায় সাপের উপদ্রব বেশি বলে ওরা ভয়ে আসে না।" লোকটি বলল।

"বুঝলাম।" ওরা কাল বাইরে থেকে জঙ্গলে ঢুকে এতটা পথ ভেঙে বাংলোয় আসেনি, ওপাশের জঙ্গল থেকে নদী পেরিয়ে গিয়েছিল! অর্জুন চট করে ভেবে নিল। তারপর বলল, "একটা পথ আছে। আমি লছমনকে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে পাঠাব। ওই বাংলোর দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়লেই তুমি সোজা বাংলোয় চলে আসবে। লছমন কখনও দোতলায় ওঠে না। তুমি নিশ্চিন্তে দোতলার ঘরে লুকিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু তুমি কে, কেন এভাবে লুকিয়ে আছ, লছমনের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক, তা আগে পরিষ্কার করে বলতে হবে।"

"আপনি তো দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন? যখন চলে যাবেন তখন তো আমি ধরা পড়ে যাব। লছমন তখন আমাকে ছাড়বে?"

"আমরা তো কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি না। তেমন হলে তুমি আমাদের সঙ্গে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাবে। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। বিকেল চারটের সময় বাংলোর দিকে লক্ষ রেখো।"

"আমি কী যে করি! আপনাকে ভালমানুষ বলে মনে হচ্ছে। ঠিক

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

আছে। আমার নাম বাদল রায়। লছমন আর আমার মধ্যে বিশ বছরের উপর জানাশোনা। জেলে আলাপ। দু'জনেই চুরির দায়ে জেল খেটেছিলাম। ওই জেলেই কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ছিল। লছমন তাদের পছন্দ করত না, এড়িয়ে যেত। কিন্তু আমার খুব ভাল লাগত। ওদের কাছ থেকে অনেক নতুন কথা জানলাম। ওরা চায় দেশে কোনও গরিব বা বড়লোক থাকবে না। সবাই সমান হবে। কারও জমি আছে কারও জমি নেই, এটা চলবে না। এসব কথা বলেছে বলে সরকার ওদের ধরে জেলে ঢুকিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়েই ওরা আবার আন্দোলন শুরু করবে। আমাকেও ওরা বলল, ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে! জেল থেকে বেরিয়ে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই ওরা দলে টেনে নিল। জানতে পারলাম, বড়লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রচুর অস্ত্র দরকার। দাম দিলেই সেগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই টাকা তো কেউ এমনি-এমনি দেবে না। আমরা ছোট-ছোট জোতদার, ব্যবসায়ীকে ধরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতাম। দু'-তিনটে খুনও করতে হয়েছিল। তবে আমি করিনি। আমাদের কেউ সাপের কামড়ে বা হাতির পায়ের চাপে মারা গেলে তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হত, কিন্তু তার বাড়িতে কোনও খবর দেওয়া হত না। মনে হত, আমি মরে গেলে আমার আত্মীয়রা কোনও খবর পাবে না। আমি ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না বলতেই ওদের চোখে খারাপ হয়ে গেলাম। আমাকে আর অ্যাকশনে নিয়ে যেত না ওরা। ক্যাম্পে রান্নার কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখত। ওরা আমাকে সন্দেহ করত। এক রাত্রে ওরা জয়ন্তীতে বেড়াতে আসা বিরাট এক ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে এল জঙ্গলে। এককোটি টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেবে। আমাদের ক্যাম্প ছিল ওই ভুটান পাহাড়ে। লোকটির আত্মীয়রা টাকার পরিমাণ নিয়ে যখন দরাদরি করছে, তখন ভুটানি পুলিশ আমাদের ক্যাম্পে হানা দিল। বন্ধু লোকটিকে ফেলে ওরা যখন পালিয়ে গেল, তখন আমি ওকে সাহায্য করলাম। তখন লোকটি ওদের কাছে বোঝার মতো। তাই প্রমাণ মুছে ফেলতে ওকে মেরে ফেলতে বলেছিল আমাকে। কিন্তু লোকটা তো নির্দোষ। কেন মারব? আমার কথা শুনে লোকটি ভুটানি পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল। তাতে খেপে গেল ওরা আমার উপর। আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিল। আমি কোনও মতে পালিয়ে এখানে চলে এলাম। একদিন লছমনের কাছে ছিলাম। সব শুনে লছমন আমাকে ওর কাছে রাখতে সাহস পেল না। রোজ চাল, ডাল, আলু দিয়ে যায়, তাই ফুটিয়ে খেয়ে বেঁচে আছি আমি। কিন্তু এভাবে আর থাকতে পারছি না।" লোকটা দু' হাতে মুখ ঢাকল।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। বলল, "তুমি বিকেলে নজর রাখবে। আমি রুমাল নাড়লে চলে আসবে। তুমি কোনও মানুষ খুন করোনি তো?"

"না। একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি বলে আমার এই অবস্থা।"

"ঠিক আছে। সাবধানে থেকো।"

বাংলোয় ফিরে এসে অর্জুন দেখল, লছমন বাগানে কাজ করছে। স্টেফি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জঙ্গল দেখছেন। কাছে যেতে স্টেফি বললেন, "মুশকিল হয়েছে। মিস্টার সোম বললেন, এখান থেকে ইউ এস এ-তে কুরিয়ার করা যাবে না। তার জন্যে শহরে যেতে হবে।"

"কী কুরিয়ারে পাঠাবে?"

"ওই পাতাগুলো। ইউনিভার্সিটি স্পেসিমেন দেখতে চাইছে। একটু আগে মেল এল। আমি পাতাগুলোর ফোটো তুলে স্ক্যান করে পাঠিয়েছি। তাতে তো ওরা বুঝবে না।"

"তুমি তো ঠিকঠাক পাতা পাওনি এখনও। ওটা পেলেই পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু স্টেফি, দেখছ তো, বিশল্যকরণী এখানে একটু ওখানে একটু ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। যদি ওর রস সত্যি কাজে লাগে তা হলে তো তোমার প্রচুর পাতা নিয়মিত লাগবে।"

"ঠিক কথা। এখানকার মাটি, আবহাওয়ার সঙ্গে মিল আছে এমন জায়গা বেছে নিয়ে ওখানে বিশল্যকরণীর চাষ করব। বিশাল বাগান তৈরি করতে তো অসুবিধে নেই। স্পনসররা খরচ মিটিয়ে দেবে।" স্টেফি বললেন।

"বাঃ। উইস ইউ গুড লাক।"

অর্জুন ঘরে গিয়ে দেখল অমল সোম চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। সে পাশে বসে লোকটার ব্যাপারে যা জেনেছে তা খুলে বলল। সব শুনে অমল সোম বললেন, "নির্ভেজাল বেড়ানো দেখছি তোমার পছন্দ নয়। কিন্তু লোকটা যে সত্যি কথা বলছে তার প্রমাণ কী?"

"কোনও প্রমাণ নেই। তবে ওই অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যে বললে যত অভিনেতা হতে হয়, লোকটা বোধ হয় তত বড় অভিনেতা নয়।"

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে স্টেফি আবার বিশল্যকরণী পাতার সন্ধানে বেরোতে চাইলেন। মেজর সেজেগুজে তৈরি। অর্জুন জানাল, তার পায়ে একটু ব্যথা হয়েছে, রেস্ট নিতে চায়। অমল সোম তাকে অব্যাহতি দিলেন। দুপুর সওয়া দু'টোয় ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। তিনজনেই লাঠি জোগাড় করে নিয়েছেন। স্টেফির হাতে একটা ঝোলা।

লছমন ওদের যাওয়া দেখছিল ভানুপ্রসাদের পাশে দাঁড়িয়ে। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যাবেন না বাবু?"

"নাঃ। ওই পাতা খুঁজতে আমার ভাল লাগবে না।"

"কী পাতা বাবু?"

ভানুপ্রসাদ তাকে বুঝিয়ে বলল মেমসাহেব কী কারণে অতদূর থেকে এসেছেন!

হাসল লছমন, "দুর! ওই পাতা দিয়ে যদি এত বড় কাজ করা যেত, তা হলে এতকাল বনেবাদাড়ে পড়ে থাকে? কবে সাফ হয়ে যেত। যাকগে, মেমদের মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা ঘোরে। একবার একটা সাহেব এসেছিল কীভাবে পাখি ডিমে তা দেয় তার ফোটো তুলতে। লম্বা গাছগুলোয় উঠে দিব্যি ঘণ্টার পর-ঘণ্টা বসে থেকে ফোটো তুলল। কিন্তু ফিরে যাওয়া ওর ভাগ্যে লেখা ছিল না।"

"কেন?"

"ঘাড় মটকে মেরে দিয়েছিল কেউ।"

"কে?"

"জানি না। পুলিশ লাশ নিয়ে গিয়েছে, খুনিকে ধরতে পারেনি।"

হঠাৎ অর্জুন ভানুপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বিরিয়ানি রাঁধতে পার?"

"চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এখানে বিরিয়ানির মশলা তো নেই। তা ছাড়া মাংস আনা দরকার।" ভানুপ্রসাদ বলল, "ওসব জিনিস রাজাভাতখাওয়াতেও পাওয়া যাবে কি না জানি না।"

লছমন বলল, "কে বলল পাওয়া যায় না? সব পাবে ওখানে।"

ভানুপ্রসাদ মাথা নাড়ল, "এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা যাওয়া-আসা করতে পারব না।"

"ঠিক আছে। লছমন, তোমার তো সব চেনাজানা। তুমি সঙ্গে যাও। মেমসাহেব এসেছেন আমেরিকা থেকে, ওঁকে ভাল খাওয়ানো দরকার।" অর্জুন বলল।

"কিন্তু!" লছমন দ্বিধায় পড়ল, "আমি বাংলো ছেড়ে যাব কী করে? মালিকের নিষেধ আছে। ওই যেদিন মাইনের টাকা দিতে লোক আসে, সে-ই সব বাজার করে আনে।"

"আরে, তোমার মালিক তো অমলদার পরিচিত। কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের কাজে বাইরে গেলে নিশ্চয়ই তিনি রাগ করবেন না। ততক্ষণ আমি তোমার হয়ে পাহারা দিচ্ছি।" অর্জুন বলল।

তবু রাজি হচ্ছিল না লছমন। কিন্তু ভানুপ্রসাদ তাকে নিচু গলায় কিছু বলতে সে মত বদলাল। লছমন বলল, "ঠিক আছে, বলছেন যখন, যাচ্ছি। সন্ধের আগেই ফিরে আসব। আপনি একটু বেশি টাকা দিয়ে দেবেন। হাতে টাকা নেই, কেরাসিন তেল কিনতে হবে।"

অর্জুন ভানুপ্রসাদকে উপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ'চারেক টাকা দিয়ে বলল, "দেখে-শুনে নিয়ে এসো। বেশি দেরি কোরো না।"

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

ওরা গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অর্জুন। চারধার কী ভীষণ চুপচাপ, ঝিঁঝির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এই জনমানবশূন্য পৃথিবীতে লছমন একা থাকে কী করে? লছমন যে এত সহজে যেতে রাজি হবে তা ভাবেনি অর্জুন। ভানুপ্রসাদ নিশ্চয়ই ওকে কোনও পানীয়ের লোভ দেখিয়েছে। সেই পানীয় পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে ওরা! ভানুপ্রসাদকে সতর্ক করা যেত, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে না বোঝার ভান করেছে।

সকালে যেদিকটায় যাওয়া হয়েছিল সেদিকে না গিয়ে উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকেছিলেন ওঁরা। ভয় পাওয়া একটা বুনো শূকর প্রায় ওঁদের গায়ের কাছ দিয়ে এমনভাবে ছুটে গিয়েছিল যে, মেজর চিৎকার করে উঠেছিলেন, "কী হচ্ছে কী!"

সেটা শুনে স্টেফি হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন। আরও কিছুক্ষণ পরে অমল সোম একটা বিষাক্ত সাপ মারলেন। মেরে বললেন, "না মেরে উপায় ছিল না! নইলে আমি মারা পড়তাম।"

মেজর হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেফি, আফ্রিকা আর এই ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যে কোনটা বেশি ভয়ংকর বলো তো?"

"আমি কখনও আফ্রিকায় যাইনি।"

"তা হলে তোমার একবার যাওয়া দরকার। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টির শীতকালে আমি প্রথম মাসাইমারায় যাই।"

"মেজর!" চাপা গলায় সতর্ক করলেন অমল সোম।

"ওঃ! এটা সত্যি ঘটনা!"

দাঁড়িয়ে গেলেন অমল সোম, "তার চেয়ে সত্যি ঘটনা হল, কাছাকাছি কোনও জন্তুর দল আছে। হাতি বা বাইসন মনে হচ্ছে। গন্ডারও হতে পারে।"

"মাই গড!"

"আমাদের ওদিকে আর এগনো ঠিক হবে না।"

"কিন্তু আমরা তো এখনও একটাও স্পেসিমেন পেলাম না।" স্টেফি বললেন।

"পেয়ে যাবে। ধৈর্য ধরো।" অমল সোম কথাগুলো বলেই দেখলেন একটা বিশাল শুঁড় কুড়ি গজ দূরত্বে গাছের ডাল সরাচ্ছে। তিনি চাপা গলায় বললেন, "পিছন দিকে দৌড়ও। নইলে সবাই মারা যাব।"

মেজরও দৃশ্যটি দেখেছিলেন। তাঁকে ওই মোটা শরীর নিয়ে আগে দৌড়তে দেখা গেল। জঙ্গলে শরীর আটকে যাচ্ছে, ছড়ে যাচ্ছে হাত-মুখ। পিছনে একাধিক হাতির চিৎকার। মেজর পিছিয়ে পড়ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ড লোহার বলের মতো হয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে। বরং স্টেফি দ্রুত তাঁদের ছাড়িয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। মেজর আর দৌড়তে পারছিলেন না। ওঁর অবস্থা দেখে অমল সোম বললেন, "গাছে উঠতে পারবেন?"

"ক্যান ট্রাই।" ফ্যাসফেসিয়ে বললেন মেজর।

বাঁ দিকের একটা গাছের ডাল নীচে পাওয়ায় তাই ধরে মেজরকে নিয়ে কোনওমতে উপরে উঠলেন অমল সোম। তারপর সেটায় পা রেখে আর-একটা উপরের ডালে উঠে এলেন। শেষ পর্যন্ত যে দূরত্বে পৌঁছলেন সেখানে হাতির শুঁড় পৌঁছনো সম্ভব নয়। মেজর কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। একটার পর-একটা হাতি গাছের তলায় জড়ো হয়ে গিয়েছে। নেতা হাতিটি উপরের দিকে মুখ করে শুঁড় নাচাল কয়েকবার। রানি চিৎকার করল। একবার এগিয়ে এসে মোটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে বুঝল, ওই গাছ ওপড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এতক্ষণে মেজরের গলায় স্বাভাবিকতা ফিরে এল, "উই আর সেফ।"

অমল সোম কিছু বললেন না।

"আপনি কিছু বলছেন না যে?"

"দয়া করে শক্ত হাতে ডালটা ধরে থাকুন।"

"আছি। কিন্তু আজ একটা ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ থাকল না।"

"কী ব্যাপারে?"

"আমার পূর্বপুরুষ অবশ্যই হনুমান কিংবা ওইজাতীয় বনমানুষ ছিলেন। এই বডি নিয়ে কীভাবে উঠে এলাম বলুন তো?" মেজর যেন নিজের পিঠ চাপড়ালেন।

হাতিগুলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে-ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

"নামতে পারবেন?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"কেন?"

"আশ্চর্য! মেয়েটার কথা ভুলে গেলেন? ও যে সেই দৌড়ে চলে গেল, কোথায় গেল, বাংলোয় পৌঁছতে পারল কি না, খোঁজ নেবেন না?"

"শিওর।" মাথা নাড়লেন মেজর, "কিন্তু নামব কী করে? নীচের দিকে তাকালেই তো মাথা ঘুরছে।"

অমল সোম ওঁকে নামাবার চেষ্টা করলেন। নীচের ডালটায় পৌঁছে শেষ রক্ষা হল না। হুড়মুড়িয়ে নীচে পড়লেন মেজর। পড়ে স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর পাশে চলে এসে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? অজ্ঞান হয়ে গেলেন নাকি?"

"না।" চোখ বন্ধ করেই মেজর বললেন, "শরীরে ক'টা ফ্র্যাকচার হয়েছে বুঝতে চাইছি।"

"একটাও হয়নি। অত চর্বি ভেদ করে হাড় পর্যন্ত আঘাত পৌঁছবে না। চলুন, মেয়েটার খোঁজ করি। যদি বাংলোর পথ ধরে তা হলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকে যায় তা হলে বিপদে পড়তে পারে।" অমল সোম বললেন।

খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল। চিৎকার করে ওঁরা ডাকতে লাগলেন, "স্টেফি! স্টেফি!"

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মেজর বললেন, "নিশ্চয়ই বাংলোয় ফিরে গিয়েছে। আজকালকার মেয়ে, তার উপর আমেরিকান, ও ভুল করবে না।"

অমল সোম দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই বাংলোটা কোন দিকে ঠাওর করতে পারছিলেন না। স্টেফি তো দৌড়চ্ছিল, ওর পক্ষে ভুল করা খুবই স্বাভাবিক।

জানলা দিয়ে নয়, একেবারে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অর্জুন চেঁচিয়ে ডাকল, "বাদল, চলে এসো।" তিনবার ডাকার পরে একমুখ সন্দেহ নিয়ে বাদল নামের লোকটা বুনো ঝোপ ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। অর্জুন তাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল।

কোনওরকমে নদী পার হয়ে এল বাদল। ও খুব আতঙ্কিত তা বুঝতে পেরে অর্জুন বলল, "ভয়ের কিছু নেই। এখন বাংলো খালি। লছমন বাজারে গিয়েছে। এসো।"

লোকটাকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল অর্জুন। বলল, "এখানে চারটে ঘর। সব ঘরেই আমাদের কেউ না-কেউ থাকে। তুমি পিছনের বারান্দায় থাকবে। এসো।"

রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে পিছনের বারান্দায় বাদলকে নিয়ে এল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোমার সেই বিছানা কোথায়?"

"ওখানেই পড়ে আছে।"

"ওঃ! যাও, চটপট নিয়ে এসো। এই বারান্দায় শোবে তুমি। রোদ, বৃষ্টি গায়ে লাগবে না। বাথরুমের দরকার হলে ওই দরজায় আস্তে-আস্তে শব্দ করবে। ভানুপ্রসাদ আমাদের ড্রাইভার, ও-ই এখন রান্না করছে, ওকে তোমার কথা বলে রাখব। ও শব্দ শুনে দরজা খুলে দিলে চটপট বাথরুম করে আসবে। খাবার ঠিক সময়ে ভানুপ্রসাদ দেবে। কিন্তু খেয়াল রেখো, ওর সঙ্গে গল্প করবে না।" অর্জুন বুঝিয়ে বলতে বাদল মাথা নাড়ল। তারপর দ্রুত নেমে গেল বাংলো থেকে।

মিনিটদশেক পর লোকটা যখন ফিরে এল বগলে ভাঁজ করা বিছানা নিয়ে, তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত দেরি হল?"

"নদীতে জল বাড়ছে। দেখুন, প্যান্ট ভিজে গিয়েছে। তারপর হাঁড়িটাড়িগুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখে এলাম, যা কেউ খুঁজে

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

পাবে না। উনুনটা ভেঙে মাটি চাপা দিতে হল। আমি ওই বারান্দায় চলে যাই?" বাদল জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, যাও। মনে রেখো কোনও শব্দ করবে না।"

বাদল এগোচ্ছিল, কিন্তু অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই লোকটার নাম কী?"

"কোন লোক?"

"যাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল, যার প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছিলে, যে এখন ভুটানি সেনার হাতে বন্দি হয়ে আছে।"

"বিজয়বাবু, বিজয়চাঁদ গুপ্তা।"

"কোথায় বাড়ি?"

"শিলিগুড়ি। বহুত বড় ব্যবসাদার।"

"ঠিক আছে, চলে যাও। আমি এপাশ থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।" ভানুপ্রসাদ যে ঘরে শুচ্ছে সেই ঘরের দরজা দিয়ে বাদলকে পিছনের বাংলোয় বের করে দিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল অর্জুন।

মেজর বা স্টেফির এই বারান্দায় আসার প্রয়োজন হবে না। সরাসরি পথও নেই। অমলদার ক্ষেত্রেও তাই। একমাত্র ভানুপ্রসাদ জানবে, ওকে না জানিয়ে বাদলকে এখানে রাখার উপায় নেই। খাবার দেবে কে?

অর্জুন বারান্দায় পায়চারি করতে গিয়ে দেখল, স্টেফির ঘরের দরজা খোলা।

সে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকাতেই ল্যাপটপটাকে দেখতে পেল। ওরকম মূল্যবান জিনিস খোলা জায়গায় ফেলে গিয়েছেন স্টেফি? অবশ্য এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে চুরি করতে কেউ আসবে না, এটাও ঠিক। অর্জুন ঘরে ঢুকে ল্যাপটপটা তুলতে গিয়ে একটু থমকাল। তারপর ওটা খুলে মিনিটতিনেক চেষ্টা করতেই মুখে হাসি ফুটল তার। না, বাদল মিথ্যে বলেনি। মিসিং পার্সন ইন নর্থবেঙ্গল, কারেন্ট মান্থ-এ বিজয়চাঁদ গুপ্তার নাম ফুটে উঠেছে। শিলিগুড়ির বিখ্যাত কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মালিক, তিনটে চা-বাগানের শেয়ারহোল্ডার মিস্টার গুপ্তাকে কেউ বা কারা ডুয়ার্সের জয়ন্তী বাংলো থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ মিস্টার গুপ্তার সন্ধান দিতে পারে, তা হলে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন। এক, ডি এস পি, শিলিগুড়ি, ও সি রাজাভাতখাওয়া। দুই, করমচাঁদ গুপ্তা, বারপাড়া, শিলিগুড়ি। টেলিফোন ২৫৯২০০৩।

ল্যাপটপ বন্ধ করে ওটাকে আলমারির মধ্যে রেখে শিলিগুড়ির নাম্বার ডায়াল করল অর্জুন। একটু পরেই রিং শুরু হল। তারপর হিন্দিভাষী একজন সাড়া দিলেন, "হেল্লো।"

"করমচাঁদজি আছেন?"

"বলতেছি।"

"নমস্কার। আমি অর্জুন। সত্যসন্ধান করা আমার নেশা এবং পেশা।"

"কী সন্ধান?"

"আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনার আত্মীয় বিজয়চাঁদ গুপ্তার খবর পেয়েছেন?"

"না। আপনি, আপনি জানেন?"

"আমি খবর পেয়েছি তিনি ভুটান সরকারের পুলিশের হেফাজতে আছেন। আপনারা দার্জিলিং-এর এস পি-কে বলুন ভুটান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।"

"দাদা বেঁচে আছে তো?"

"কিডন্যাপারদের হাত থেকে পালিয়েছেন বলে মারা যাওয়ার আশঙ্কা কম। ঠিক আছে। রাখছি।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ঠিকানা দিন।"

অর্জুন উত্তর না দিয়ে লাইন কেটে দিল। ল্যান্ডলাইনে ফোনটা করেছিল বলে করমচাঁদ তার মোবাইল নাম্বার পাবে না।

দরজা ভেজিয়ে বাইরে আসতেই ওঁদের দেখতে পেল অর্জুন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায় অমল সোম আর মেজর গেটের দিকে এগিয়ে আসছেন। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড ধকল গিয়েছে ওঁদের উপরে। সে দ্রুত নেমে দূরত্বটা পেরিয়ে গেট খুলে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আপনাদের? স্টেফি কোথায়?"

অমল সোম বললেন, "খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। হাতির দলের সামনে পড়ায় আমরা দৌড়ে পালিয়েছিলাম। স্টেফিও দৌড়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ও আমাদের দলছাড়া হয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেও ওর হদিশ পেলাম না। ভেবেছিলাম, স্টেফি বাংলোয় ফিরে এসেছে। নাঃ, আবার খুঁজতে বেরোতে হবে।"

মেজর হাঁপাচ্ছিলেন, "ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। নইলে কোন মুখে ওদেশে ফিরব?"

"কিন্তু এত বড় জঙ্গলে খুঁজে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বলুন। ওরা চিরুনিতল্লাশি করে ওঁকে বের করতে পারবে।"

অমল সোম বললেন, "এদিকে সন্ধে হতে তো দেরি নেই। দেখি, ডি এফ ও-কে ফোন করি।" সেলফোনের নাম্বার টিপলেন অমল সোম। কানে চেপে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাচ্চলে। সব সাদা।"

অর্জুন বলল, "নাম্বারটা বলুন। আমারটা দিয়ে চেষ্টা করি।"

অর্জুনের ফোনে ডি এফ ও-কে পাওয়া গেল। অমল সোম তাঁকে স্টেফির সমস্যা জানালেন। ডি এফ ও বললেন, উনি দেখছেন কী করা যেতে পারে।

এই সময় ভানুপ্রসাদের গাড়ি ফিরে এল। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কোথায় গিয়েছিল?"

"খাবারদাবার কিনতে।" অর্জুন বলল।

মেজর বললেন, "স্টেফি না ফেরা পর্যন্ত আমরা কেউ কিছু খাব না।"

ভানুপ্রসাদ স্টেফির ব্যাপারটা শুনে বলল, "চলুন সাব। আমরা খুঁজে দেখি। মেমসাহেব রাস্তা হারিয়ে নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছেন।"

লছমন বলল, "গিয়ে কোনও লাভ হবে না।"

ভানুপ্রসাদ তাকাল ওর দিকে, "কেন?"

"এই জঙ্গলে হারিয়ে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।" লছমন বলল, "জঙ্গল গিলে ফেলে তাকে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে রাত নেমে যাবে। আপনারাও ফেরার পথ খুঁজে পাবেন না।"

মেজর খেপে গেলেন, "মার্ডারার? মোস্ট সাসপিসিয়াস ক্যারেক্টার।"

অর্থ বুঝল কি না সে-ই জানে, লছমন তার ঘরের দিকে চলে গেল।

অর্জুন ভানুপ্রসাদকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। চিৎকার করে স্টেফিকে ডাকছিল সে। ভানুপ্রসাদ চেঁচাচ্ছিল, "মেমসাব! মেমসাব!" কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ক্রমশ জঙ্গলের ভিতরে ছায়া ঘন হয়ে আসছিল। ভানুপ্রসাদ বলল, "আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। রাত্রে তো খুঁজে পাব না। যদি মেমসাব না আসেন, কাল ভোরে চলে আসব জঙ্গলে।"

কথাটা যুক্তিপূর্ণ।

বিরিয়ানি রান্না স্থগিত হল। ক্রমশ অন্ধকারে চারপাশ ডুবে যেতে ভানুপ্রসাদ চা এনে দিল তাঁদের। তাতে চুমুক দিয়ে অর্জুনের খেয়াল হল, বাদলের কথা এখনও বলা হয়নি ভানুপ্রসাদকে। এই সময় বারান্দায় লছমনকে দেখা গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

"আপনারা আমার উপর রাগ করছেন স্যার, কিন্তু আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আমার কথা শুনে যদি চলে যেতেন, তা হলে মেমসাহেব বেঁচে যেতেন।" দু'টো হাত বুকের উপর জড়ো করে বলল লছমন।

"তোমার ধারণা মেমসাহেব মারা গিয়েছেন?"

জিভ বের করল লোকটি, "ছি ছি। তবে মন তো সবসময় কু

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

ডাকে।"

"কী বলতে এসেছ?"

"শুনলাম, বিরিয়ানি হবে না আজ। ভালই করেছেন। আমি বলি কী, তাড়াতাড়ি যাই হোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ুন। ভোরের আগে কেউ দরজা খুলবেন না।"

"কেন?" অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল।

"মানুষের রক্ত পান করলে তেনারা ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। তখন বাইরে না আসাই ভাল।"

"কোন মানুষের রক্ত কারা পান করল?"

"আপনি কি ভাবছেন মেমসাব বেঁচে আছেন? এই জঙ্গলে পথ হারিয়ে সারারাত কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। চিতা না খাক, নেকড়ে শেষ করে দেবে। আর তেনাদের খপ্পরে পড়লে তো কথাই নেই।"

"তখন থেকে তেনারা-তেনারা করছ, তেনাদের নাম কী?"

"রাত নামলে ওই নাম উচ্চারণ করতে নেই। আচ্ছা, ভানুপ্রসাদকে বলবেন আমার জন্যে রাতের খাবারের দরকার নেই। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে চিড়ে-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব।" লছমন কপালে আঙুল ছুঁইয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে।

অর্জুন বসার ঘরে ঢুকল। অমল সোম তাকালেন। মেজর দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন।

অমল সোম বললেন, "মেয়েটা যদি গাছে উঠতে পারে তা হলে বিপদে পড়বে না।"

"বিপদে পড়বে না!" খিঁচিয়ে উঠলেন মেজর, "কেন? গাছে সাপ নেই? পাইথন একটা মোষ গিলে ফেলে, মানুষ তো ছার!"

"কিন্তু এই রাতে ডি এফ ও-কে জানানো ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি?"

"আমরা এখন থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে পারি। পুলিশ যদি এখনই স্টেফির খোঁজে জঙ্গলে সার্চ করে তা হলে ওকে পেয়ে যাবই।" মেজর বললেন।

"এই সময় ভানুপ্রসাদ গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে থানায়? জিজ্ঞেস করে দেখুন।" অমল সোম কাঁধ নাচাতেই অর্জুন তার সেলফোন বের করে নাম্বার টিপল। রিং হল। অর্জুন সাড়া পেতেই কথা বলল, "নমস্কার। আমি অর্জুন বলছি। চিনতে পারছেন? ধন্যবাদ। এখন আমরা একটা ফরেস্টের লাগোয়া বাংলোয় আছি। বাংলোটার মালিক শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সুধাংশুশেখর দত্ত। রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী যাওয়ার রাস্তায় এসে বাঁ দিক ধরে এখানে পৌঁছনো যায়। আমরা চারজন ছিলাম। একজন মহিলা, তিনি আমেরিকান, গবেষণার কাজে এসেছেন। আজ জঙ্গলে গিয়ে মহিলা হারিয়ে যান। না না, হাতির ভয়ে পালিয়ে আসছিলেন সবাই, মহিলা বোধ হয় রাস্তা ভুল করেছেন। ওঁর নাম স্টেফি। যদি লোকাল থানাকে ইনফর্ম করেন, ওঁরা ওঁকে খুঁজে বের করতে পারে।" একটানা কথাগুলো বলে গেল অর্জুন। তারপর ওপাশের কথা শুনল। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে অর্জুন বলল, "জলপাইগুড়ির এস পি সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম। উনি নোট করে নিয়েছেন। এটাই ডায়েরি বলে ট্রিট করা হবে। উনি এখনই লোকাল থানাকে নির্দেশ দিচ্ছেন কাজ শুরু করতে।"

সোফায় বসে অর্জুন বলল, "আমার বিশ্বাস, কালই স্টেফিকে পেয়ে যাব।"

"কী করে বিশ্বাস হচ্ছে?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"এই জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী আছে বটে কিন্তু কোনও ম্যানইটার নেই। থাকলে সেই খবর আমরা জলপাইগুড়িতে বসে জানতে পারতাম। যাকগে, আপনারা যখন জঙ্গলে গিয়েছিলেন। তখন আমি একটি লোককে সাহায্য করেছি।" অর্জুন বলল।

অমল সোম তাকালেন, কিছু বললেন না।

অর্জুন বলল, "পিছনে যে নদী রয়েছে তার পরেই পাহাড় শুরু। ওটা ভুটানের। ওই পাহাড়ে ভুটান সরকারের পুলিশ খুব সতর্ক নয়। তার ফলে ভারতীয় উগ্রপন্থীরা ওখানে আশ্রয় নিয়ে এখানে হামলা চালায়। ওরা বড়লোক ভারতীয়দের কিডন্যাপ করে ভুটানে নিয়ে গিয়ে মোটা টাকা দাবি করে। টাকা পেলে ছেড়ে দেয়। যাকে আমি সাহায্য করেছি সে পাকেচক্রে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং মানাতে পারছিল না। কয়েকদিন আগে ওরা শিলিগুড়ির এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করে জয়ন্তী থেকে। মোটা টাকা মুক্তিপণ চায়। কিন্তু ওদের কপাল খারাপ হওয়ায় একদিন ভুটানি পুলিশ পথভুল করে ক্যাম্পের কাছে চলে আসায় ওরা পালাতে বাধ্য হয়। এই লোকটিকে নির্দেশ দেয় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে মেরে ফেলতে। সেই নির্দেশ পালন করেনি লোকটা। ব্যবসায়ীর প্রাণ সে বাঁচিয়ে দেয়। সম্ভবত ভুটানি পুলিশের হেফাজতে আছে ব্যবসায়ী। কিন্তু লোকটি ভয় পাচ্ছে উগ্রপন্থীরা এবার তাকে মেরে ফেলবে। ফলে

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

সে জঙ্গলে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়ে এখানে চলে আসে। লছমনের সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল। কিন্তু উগ্রপন্থীদের ভয়ে লছমন ওকে বাংলোয় আশ্রয় দেয়নি। নদীর ওপারের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে বলেছে। রোজ চাল-আলু দিয়ে আসে লোকটাকে। ওদিকে সাপের উপদ্রব বেশি থাকায় উগ্রপন্থীরা আসতে ভয় পায়। তারা লছমনকে বলেছিল জঙ্গলে নজর রাখতে। মাঝে-মাঝে রাত গভীর হলে ওরা এখানে আসে। লছমন তাই লোকটাকে অন্য কোথাও চলে যেতে চাপ দিচ্ছিল। আমাদের বলেছিল বাংলোয় না থাকতে। কারণ, উগ্রপন্থীরা চায় বাংলোটা ফাঁকা থাক। আমি লছমনকে ভানুপ্রসাদের সঙ্গে বাজারে পাঠিয়ে লোকটাকে এই বাংলোয় তুলে এনেছি। পিছনে বারান্দায় আছে লোকটা। ও যে এখানে আছে তা লছমন জানে না।"

পিছনে শব্দ হতেই অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে ভানুপ্রসাদকে দেখতে পেল। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অর্জুনের কথাগুলো শুনছিল সে।

"গুড জব। লোকটার নাম কী?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"বাদল।"

"লোকটাকে এখানে আসতে বলো।" মেজর বললেন।

"আজই না। ও ঘাবড়ে যেতে পারে।" অর্জুন উঠল, "ভানুপ্রসাদ, তুমি তো সব শুনেছ। সাবধান, লছমন যেন জানতে না পারে।"

"কেউ জানবে না সাহেব।"

"চলো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

নিঃশব্দে দরজা খুলতেই দেখা গেল বারান্দার ভিতরের কোণে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে লোকটা। অর্জুন নিচু গলায় 'বাদল' বলে ডাকতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। হাতে সেই কাটারি। অর্জুন বলল, "শোনো, এর নাম ভানুপ্রসাদ। যখন যা দরকার হবে ওকে ডেকে বলবে।"

মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল বাদল।

ভানুপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল, "চা খাবে?"

বাদলের মুখ হাসিতে ভরে গেল। দ্রুত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

অর্জুন ইশারায় ভানুপ্রসাদকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "বেশি ভাব করার দরকার নেই। খেয়াল রেখো, বারান্দায় যেন আলো না পড়ে।"

ভুটানের পাহাড়ে উগ্রপন্থীরা ক্যাম্প করেছে এই খবর কলকাতার কাগজে ছাপা হয়েছে। ভারত সরকারের চাপে পড়ে ভুটান সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে। বর্ডার পেরিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রে গেলে ধরা পড়ার ভয় নেই বলে তারা বহালতবিয়তে রয়েছে। অমল সোমের সঙ্গে অর্জুন এই ব্যাপারে কথা বলছিল। মেজর বসে থাকতে-থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

রাত বাড়ছে। ভানুপ্রসাদ আজ চিকেন আর ভাত বানিয়েছিল। তাই খেয়ে সবাই যে-যার ঘরে চলে গেলে অর্জুন অন্ধকার বারান্দার এক কোণে এসে দাঁড়াল।

"কী ভাবছ?"

অর্জুন দেখল, অমল সোম তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

"বুঝতে পারছি না। অস্বস্তি হচ্ছে।"

"হুম। আমি তোমার কথা শোনার পর অন্য কিছু ভাবছি। স্টেফি যদি উগ্রপন্থীদের হাতে পড়ে, তা হলে ভয়ানক বিপদ হবে। ও আমেরিকান, জানামাত্র ওরা প্রচুর টাকা মুক্তিপণ চাইবে।"

"বোধ হয় সেই ভয় নেই। ওরা থাকে ভুটানের পাহাড়ে। নদী পেরিয়ে এদিকে আসে বিশেষ পরিকল্পনা থাকলে। স্টেফি জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। তার সঙ্গে ওদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়।"

"লেট্‌স প্রে দ্যাট।"

অর্জুন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। কাল রাতের লোক দু'টো গেট খুলে ঢুকছে। ভিতরে এসে বাংলোর দিকে তাকাল। বাংলোর কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। ওরা ধীরে-ধীরে বাংলোর পিছন দিকে চলে গেল।

অর্জুন অমল সোমকে বলল, "কিচেনের জানলায় চলুন।"

নিঃশব্দে জানলার পাশে এসে শব্দ না করে সেটা ঈষৎ খুলতেই গলা শুনতে পেল। "তুই আমাদের সঙ্গে দু'নম্বরি করছিস লছমন।"

"বিশ্বাস কর আমি কিছু জানি না।"

"আজ বিকেলে ওকে ওই নদীর ওপারে আমাদের একজন দূরবিনে দেখেছে। ওখানে কেউ থাকলে তুই জানতে পারবি না?"

"তা হলে আজই এসেছে।"

"ওখানে কোথায় লুকিয়ে থাকা যায় জানিস?"

"জানি।"

"চল, গিয়ে দেখি।"

"এই রাত্রে? ওখানে সাপ আছে।"

"তুই আগে যাবি। সাপ থাকলে তোকে কামড়াবে।"

অত্যন্ত অনিচ্ছায় লছমনকে দেখা গেল ওদের নিয়ে নদীর দিকে যেতে।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "উগ্রপন্থীদের লোক?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। চলুন, নীচে যাই।"

"কী করতে চাও?"

"ওই দু'জনকে আটকালে জানা যাবে ওরা আজ স্টেফিকে পেয়েছে কি না।" অর্জুন বলল, "তা ছাড়া বাদলের প্রাণ বাঁচাতেও ওদের আটকানো দরকার। আমি ভানুপ্রসাদকে ডাকছি। ওর সাহায্য দরকার হবে।"

অর্জুন ভানুপ্রসাদকে ডাকতে গেল। অমল সোম দেখতে পেলেন, একটা টর্চের আলো জ্বেলে কেবল তিনটে ছায়ামূর্তি নদী পার হচ্ছে। এখন নদীর জল সম্ভবত বেড়ে গিয়েছে। কারণ, ওদের পার হতে সময় লাগল। ওপারে পৌঁছে তিনজনই চোখের আড়ালে চলে গেল। অমল সোম বুঝলেন, ওরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এলেন তিনি।

ইতিমধ্যে ভানুপ্রসাদকে নিয়ে চলে এসেছে অর্জুন। অমল সোম বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই ওদের আটকাতে চাও। কীভাবে? ওরা সশস্ত্র কি না তা তুমি জানো না।"

"অন্ধকারের সুযোগটা নেব। ওরা দু'জন। আমি আর ভানুপ্রসাদ যদি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ি, তা হলে লোক দু'টোকে কব্জা করতে পারব। ওদের অস্ত্র থাকলেও বের করতে পারবে না।"

নদীর ধারে চলে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়াল ওরা। হঠাৎ ওপার থেকে চেঁচামেচি ভেসে এল। একজন খুব উত্তেজিত হয়ে গালাগালি দিচ্ছে। তারপরেই দেখা গেল একজনকে ঠেলতে-ঠেলতে বাকি দু'জন নদীতে নামল। সেই দু'জনের একজন টর্চ ধরেছে বলে মুখ পরিষ্কার হচ্ছিল না। অমল সোম বললেন, "লছমনকে গালাগাল দিচ্ছে কেন?"

ওরা নদী পার হচ্ছিল। অর্জুন বলল, "ওরা লছমনের দেখানো জায়গায় বাদলকে খুঁজে পায়নি। নিশ্চয়ই ওকে এখন অবিশ্বাস করছে।"

ভানুপ্রসাদকে বোধ হয় আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল অর্জুন। সে দ্রুত ওপাশের আড়ালে চলে এল। ওরা নদীর এপারে পৌঁছে গিয়েছে এর মধ্যে। একজন বলল, "তুই বেইমানি করেছিস লছমন। বেইমানদের কী সাজা দেওয়া হয় তা তুই জানিস! শেষবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বাদলকে?"

"আমি জানি না, বিশ্বাস কর। আজ দুপুরেও ওকে ওখানে দেখেছিলাম। পাথরের উনুনে রান্না করেছিল। ওগুলো তুলে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছে!"

"জানিস না।" জোরে ধাক্কা মারতেই উপুড় হয়ে পড়ে গেল লছমন।

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "বাদলকে এই বাংলোর ভিতরে লুকিয়ে রাখেনি তো?"

"আমার তাই সন্দেহ হচ্ছে। আগে ব্যাটাকে বেঁধে ফ্যাল, তারপর খুঁজে দেখব। ওর ঘরে গিয়ে দ্যাখ, নিশ্চয়ই দড়ি পাবি।"

প্রথম লোকটার কথা শুনে দ্বিতীয় লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই ভানুপ্রসাদ বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অর্জুন চটপট মুখ

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

চেপে ধরল লোকটার। ওর কোমর থেকে দিশি রিভলভার বের করে শাসাল, "আওয়াজ করলেই মেরে ফেলব।"

লোকটাকে উপুড় করে ওরই জামা দিয়ে এমনভাবে বেঁধে ফেলল অর্জুন যে, নড়তে-চড়তে পারছিল না আর। দ্বিতীয় লোকটা দড়ি নিয়ে ফিরে এসেই আক্রান্ত হল। তাকেও বেঁধে ফেলতে অসুবিধে হল না। লছমন মাটিতে বসে ফ্যালফ্যাল করে ব্যাপারটা দেখছিল। অর্জুন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এদের তুমি চেনো? এরা কারা?"

লছমন চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল, "না।"

সঙ্গে-সঙ্গে তার চুলের মুঠো ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, "ওরা তোমাকে আজ শেষ করে দেবে জানা সত্ত্বেও তুমি সত্যি কথা বলবে না?"

লছমন জবাব না দিয়ে অন্যদিকে তাকাল। অর্জুন হাসল, "বেশ, তা হলে ওদের বলে দিচ্ছি, বাদলকে চাল-আলু তুমি সাপ্লাই দিতে। তোমরা দু'জন একসময় একসঙ্গে জেল খেটেছিলে।"

"আপনি, আপনি জানলেন কী করে?" লছমন বিভ্রান্ত।

"জানি। এরা ওই দলের লোক, যারা ব্যবসায়ীদের কিডন্যাপ করে।" অর্জুন বলল, "হ্যাঁ কি না?"

মুখে শব্দ না করে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল লছমন।

লোক দু'টোকে বসিয়ে দেওয়া হল। দু'জনের দু'টো হাত পিঠের দিকে টেনে বাঁধা হয়েছে। দু'টো পা শক্ত করে বেঁধেছে ভানুপ্রসাদ। এবার অমল সোম এগিয়ে এলেন, "তোমরা তো সাধারণ সদস্য। কেউ নেতা নও। আমরা যা জিজ্ঞেস করব তার উত্তর দিলে তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি।"

লোক দু'টো কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বিজয়চাঁদ কোথায় আছেন?"

দ্বিতীয়জন মাথা নাড়ল, "আমি জানি না।"

"তুই?"

প্রথমজন বলল, "ক্যাম্পে ছিল। আমরা যখন ক্যাম্প ছেড়েছিলাম তখন লোকটা বাদলের হেফাজতে ছিল। বাদল জানে।"

"বাদলকে খুঁজছিস কেন? মেরে ফেলবি ওকে?"

"ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

"কীভাবে?"

"বিজয়চাঁদকে ছেড়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই বিজয়চাঁদ ওকে টাকার লোভ দেখিয়েছে।"

"তোদের দলের বাকিরা এখন কোথায়?"

"ওপারে। এখান থেকে দেড়মাইল দূরে। আমরা আজই এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতাম, কিন্তু...!" বলেই থেমে গেল দ্বিতীয়জন।

"কিন্তু কী?" অর্জুন ধমকাল।

প্রথমজন বলল, "অনেক বলে ফেলেছিস তুই!"

"না, মানে...!" দ্বিতীয় লোকটির মুখে ভয় ফুটল।

অমল সোম তার হাত তুলে নিয়ে কনুই-এর নীচে চাপ দিতেই লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। অমল সোম হাত সরিয়ে বললেন, "মুখ না খুললে তোমার হাত চিরজীবনের জন্যে অসাড় করে দেব।"

"আজ সন্ধের সময় একটা নতুন মুরগি ধরে গিয়েছি আমরা। সাদা মেমসাব। শেষ রাত্রে নেতা একে-ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঠিক হবে আমরা এখানে থাকব, না সরে যাব। যা জানি বলে দিলাম। আমি আর পারছি না।" গলায় কান্না মিশল লোকটার।

"কেন?"

"এ একটা জীবন? চোরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। টাকা যা আসছে তা আমরা কেউ চোখে দেখতে পাচ্ছি না। ওসব নাকি অস্ত্র কিনতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নির্দেশে ওদের মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লছমনের ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেওয়া হল।

ভানুপ্রসাদ লছমনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এর কী হবে?"

সঙ্গে-সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল লছমন, "আমি ওদের ভয়ে সবসময় মিথ্যে কথা বলেছি। এখানে থাকলে ওরা আপনাদের বিপদে ফেলতে পারে মনে করে চলে যেতে বলেছি, ভূতের ভয় দেখিয়েছি। আমায় মাপ করুন।"

অমল সোম বললেন, "তুমি বাংলোর বারান্দায় গিয়ে বসো। ওখান থেকে নামবে না।"

অর্জুন লছমনকে নিয়ে বাংলোর বারান্দায় চলে এল। লছমন কাতর গলায় বলল, "বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন। এখনই যদি এখান থেকে না পালিয়ে যাই তা হলে মারা পড়ব।"

"কীভাবে?"

"ওরা ফিরে না গেলে দলের লোকেরা খুঁজতে আসবেই।"

"পুলিশকে ওদের কথা আগে জানাওনি কেন?"

মাথা নাড়ল লছমন, "পুলিশকে জানালে ওরা ঠিক খবর পেয়ে যেত।" হাতজোড় করল সে, "আপনারাও ভোর হলে এখান থেকে চলে যান বাবু।"

"তুমি ভিতরে এসো।"

হ্যারিকেনের আলোয় বাদলকে দেখে ভূত দেখার মতো অবস্থা লছমনের। কোনওরকমে বলল, "তু-তুই! তুই এখানে?"

"আমি ওকে জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছি। না আনলে ওর কী অবস্থা হত তুমি জানো। যাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে তারা নিশ্চয়ই ভালবাসার কথা বলত না।"

"তুই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলি?" প্রায় চিৎকার করে উঠল বাদল।

"আঃ। চেঁচিও না।"

"না নিয়ে গেলে ওরা আমাকে মেরে ফেলত।" লছমন মিনমিনে গলায় বলল।

"তুই আমাকে খতম করতে ওদের নিয়ে গিয়েছিলি?"

"যা হওয়ার তা হয়েছে, এখন বাঁচতে চাস তো এখান থেকে পালিয়ে চল।"

"আমি তোর সঙ্গে কোথাও যাব না।"

অর্জুন বলল, "মান-অভিমান করে লাভ নেই।"

অমল সোম ঘরে ঢুকলেন, "নাঃ। ও দু'টোকে উপরে নিয়ে আসাই ভাল। লছমন যেমন নীচে থাকে তাই থাক। ওর সঙ্গে ভানুপ্রসাদ থাকবে, যাতে পালাতে না পারে। যদি ওই দু'টোর সন্ধানে কেউ ঢোকে তা হলে লছমন বলবে সে কিছুই জানে না, কোনও লোক আজ রাত্রে বাংলোয় ঢোকেনি।"

"ভোরের আগেই আসতে পারে।" অর্জুন বলল, "কাল তিনজন এসেছিল। আজ এই দু'জন ফিরে না গেলে তৃতীয় ব্যক্তি এদের সন্ধানে আসতে পারে।"

ভানুপ্রসাদ আর লছমন একে-একে ওই দু'জনকে উপরে নিয়ে এসে পিছনের বারান্দায় শুইয়ে রাখল। অমল সোম বাঁধনগুলো আরও শক্ত করে দিলেন। লছমন আর ভানুপ্রসাদ নীচে নেমে গেলে অমল সোম বললেন, "আর রাত জেগে লাভ নেই। শুয়ে পড়া যাক!"

অর্জুন বলল, "কিন্তু স্টেফিকে উদ্ধার কীভাবে করবেন?"

"যেভাবেই করো। আজ রাত্রে নিশ্চয়ই তা করা সম্ভব নয়। কাল সকালে ভাবা যাবে। আর এ ব্যাপারে বাদল বোধ হয় আমাদের সাহায্য করতে পারবে।"

"বাদল? কীভাবে?"

"কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক অর্জুন।"

অমল সোমের কথা শেষ হওয়ামাত্রই একটা হাল্‌কা গর্জন কানে এল। বাদল দৌড়ে কাছে এসে বলল, "বোধ হয় বাঘ!"

নিজের ঘরে যেতে-যেতে অমল সোম বললেন, "অর্জুন, মেজরকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দাও। চিত হলেই ওঁর নাক থেকে বাঘের আওয়াজ বের হয়!"

না। ওই রাত্রে কেউ আর এই বাংলোয় ঢোকেনি। যতই বিছানায় শুয়ে থাক, ঘুম ভেঙে ছিল বারবার। যখন ভোর হল, জঙ্গলে পাখিরা

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

তুমুল চেঁচামেচি শুরু করল, তখন অর্জুন বারান্দায় বেরিয়ে এল। লছমনের ঘরের দরজা ভেজানো। একটা অস্বস্তি নিয়ে দরজা ঠেলতেই ভানুপ্রসাদকে দেখতে পেল। পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। লছমন নেই। দ্রুত নদীর ধারে এসে চারদিকে তাকাল। না, কোথাও তার চিহ্ন নেই। ফিরে গিয়ে ভানুপ্রসাদকে কয়েকবার ডাকতেই সে চোখ খুলল। অর্জুনকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "লছমন কোথায়?"

"ও তো ওপাশে শুয়ে ছিল।"

"কখন শেষবার দেখেছ?"

"রাত্রে।"

"চারপাশ খুঁজে দ্যাখো তো।"

ভানুপ্রসাদ খুঁজতে বের হল। বাংলোর ভিতরে লছমন নেই। গাড়ির কাছে গিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। ফিরে এসে বলল, "সাহেব, কাল গাড়ির চাকা খোলার চেষ্টা করেছিল কেউ!"

"খুলতে পেরেছিল?"

"না। একটু আলগা করতে পেরেছিল।"

"লোকটা চেয়েছিল গাড়িটাকে অকেজো করে আমাদের বিপদে ফেলতে।"

"কী হয়েছে?" বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন অমল সোম।

ব্যাপারটা জানাল অর্জুন।

"এরকম কিছু ঘটতে পারে তা আমাদের ভাবা উচিত ছিল। লছমন চেয়েছিল যাতে গাড়ি নিয়ে আমরা ওকে খুঁজতে বেরোতে না পারি। ও নিশ্চয়ই গভীর রাত্রে জঙ্গলের পথ ধরবে না। গিয়েছে আলো ফুটতে। তোমরা খানিকটা যাও গাড়ি নিয়ে। যদি বেশিদূর যেতে না পারে ও, দ্যাখো।" অমল সোম ভিতরে চলে গেলেন।

চাকা টাইট করে ভানুপ্রসাদ অর্জুনকে নিয়ে বের হল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওরা গভীর জঙ্গলে মোড়া কাঁচা রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। এখনও রোদ নরম, তাই জঙ্গলের ভিতরে ঘন ছায়া নেতিয়ে রয়েছে। কিছু দূর যাওয়ার পর ব্রেক চেপে গাড়ি থামাল ভানুপ্রসাদ। পাশের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা পায়েচলা পথ চলে গিয়েছে। সেটা দেখিয়ে ভানুপ্রসাদ বলল, "কাল লছমন রাজাভাতখাওয়ায় যাওয়ার সময় বলেছিল, ওই পথ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি রাজাভাতখাওয়ায় যাওয়া যায়।"

অর্জুন সামনের দিকে তাকাল। রাস্তা এখানে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত সোজা। লছমনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থেকে নামল অর্জুন, "চলো, খানিকটা হেঁটে দেখে আসি।"

গাড়িটাকে রাস্তার একপাশে রেখে ভানুপ্রসাদ সঙ্গী হল। সরু পথ, দু'পাশের গাছগুলোর ডাল-পাতা তার অনেকটাই দখল করে রেখেছে। সেগুলো সরিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হলেও, ওরা চেষ্টা করছিল দ্রুত চলতে। মিনিটদশেক হাঁটার পর জঙ্গল যখন আরও বেশি গভীর, তখন পথ বাঁক নিল। সেখানে পৌঁছতেই চিৎকার করে উঠল ভানুপ্রসাদ, "সাব!"

ওকে লক্ষ করে মুখ ফেরাতে দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন। মানুষটা মাটিতে পড়ে, আছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে। একটু কাছে যেতে লছমনকে চিনতে অসুবিধে হল না। ওর বুক-পেট ফেটে চেপটে গিয়েছে মাটিতে। দু'টো পা-ই মুচড়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। রক্তে মাটি লাল হয়ে আছে এখনও। কোনও মানুষের পক্ষে এভাবে হত্যা করা সম্ভব নয়।

ভানুপ্রসাদ ফিসফিসিয়ে বলল, "হাতি, হাতি ওকে মেরেছে। ওই দেখুন!"

কিছুটা দূরে পড়ে থাকা হাতির বিষ্ঠা দেখাল ভানুপ্রসাদ।

সেলফোন বের করে অমল সোমকে ফোন করল অর্জুন, "জঙ্গলের ভিতরে লছমনের ডেডবডি পড়ে আছে। মনে হচ্ছে হাতির সামনে পড়েছিল। একেবারে স্ম্যাশড। ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো দরকার। আপনি যদি বলেন আমরা এখান থেকে থানায় গিয়ে জানিয়ে আসতে পারি।"

"তার দরকার নেই। আমি ফোনে এস পি'কে বলছি। জায়গাটা ঠিক কোথায়?"

"আমি কয়েক মিনিট পরে গাড়ির রাস্তায় ফিরে গিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি।"

মনখারাপ হয়ে গেল অর্জুনের। এখানে আসার পরে লোকটার সঙ্গে তার ঠকাঠকি লাগছিল বটে, কিন্তু এভাবে মরে যাবে কল্পনা করেনি। লোকটা ক্রিমিনাল নয়, স্রেফ উগ্রপন্থীদের ভয়ে ওরকম আচরণ করছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে ভানুপ্রসাদ বলল, "ও যদি গাড়ির রাস্তায় যেত তা হলে এভাবে মরতে হত না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে শর্টকাট পথ ধরে মারা পড়ল বেচারা!"

বড় রাস্তায় পৌঁছে জায়গাটার বর্ণনা অমল সোমকে সেলফোনে জানিয়ে দিল অর্জুন।

এস পি'কে ফোনে পেতে একটু দেরি হল। পাওয়ার পর অমল সোম জানালেন ঘটনা দু'টোর কথা। যে বাংলোয় তাঁরা উঠেছেন তার দরোয়ান আজ ভোরে জঙ্গলে হাতির পায়ে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। তার মৃতদেহ এখনও জঙ্গলে পড়ে আছে। কীভাবে সেখানে পৌঁছতে হবে তাও জানিয়ে দিলেন তিনি।

এস পি সব নোট করে নেওয়ার পর অমল সোম বললেন, "আমি গতকাল ডি এফ ও সাহেবকে জানিয়েছিলাম, আমাদের সঙ্গে আসা একজন আমেরিকান মহিলা জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছেন। আমি জানি না তিনি আপনাকে জানিয়েছেন কি না! মহিলা এখনও ফিরে আসেননি। একটু আগে জানলাম, তাঁকে উগ্রপন্থীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

"কী করে জানলেন?"

"আমরা দু'জন উগ্রপন্থী, যারা এই বাংলোয় এসেছিল, তাদের ধরে রেখেছি। তাদের মুখ থেকেই খবরটা বেরিয়েছে।"

"খুব ভাল করেছেন মিস্টার সোম। আমাদের যে পার্টি ডেডবডি তুলে আনতে যাচ্ছে তাদের হাতে ওদের তুলে দিন। খুব দুঃখের সঙ্গে আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি। আজ সকালে উগ্রপন্থীরা লোকাল থানায় ফোন করে বলেছে যে, তারা স্টেফি নামের একজন মহিলাকে কিডন্যাপ করেছে। মহিলা আমেরিকান। চারদিনের মধ্যে দু' কোটি টাকা না পেলে ওরা ওঁকে মেরে ফেলবে। মহিলার আমেরিকার ফোন নাম্বার ওরা দিয়েছে। আমরা মার্কিন কনসুলেটের সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছি। বুঝতে পারছেন, ওরা টাকার গন্ধ পেয়ে গিয়েছে। এর আগে যাঁদের কিডন্যাপ করেছিল তাঁদের উদ্ধার আমরা করতে পারিনি, কারণ, ওরা ক্যাম্প করত ভুটানে। ওখানে আমাদের পুলিশের ঢোকার অধিকার নেই। তবু, ঘটনা যেমন ঘটবে আপনাকে তা জানিয়ে দেব।" এস পি বললেন।

দ্বিতীয় ফোনটা করলেন অমল সোম সুধাংশুশেখর দত্তকে। তাঁকে শিলিগুড়ির বাড়িতেই পাওয়া গেল। খবরটা শুনে চেঁচিয়ে উঠলেন, "সে কী? ভোরবেলায় লছমন জঙ্গলে কেন গিয়েছিল? ও তো জানে ভোরের মুখে জঙ্গলের হাতি বাংলোর দিকে চলে আসে। আঃ। আমি একটু পরেই রওনা হচ্ছি।"

অর্জুন এবং ভানুপ্রসাদ ফিরে এল। ততক্ষণে মেজর উঠে পড়েছেন। তাঁকে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাগুলো বলেছেন অমল সোম।

মেজর বললেন, "যাচ্ছলে! লোকটাকে আমি পছন্দ করছিলাম না বটে, কিন্তু ও পালাল কেন? সবাইকে বিপদে ফেলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল বলে শাস্তিটা পেল। কিন্তু স্টেফির কী হবে? টাকা না পেলে ওকে কি খুন করবে ওরা?"

"সেটাই চালু নিয়ম।"

"নিয়ম? মেয়েটা আমার ভরসায় এ দেশে এসেছে। মেরে ফেলবে বললেই হল? মানলাম, এক দেশের পুলিশ অন্য দেশে যেতে পারে না। চলুন, আমরা ভুটান পুলিশকে বলি ওকে রেসকু করতে।" মেজর উত্তেজিত।

"তাদের কোথায় পাবেন?"

"ওই পাহাড়ে যখন ভুটানিরা থাকে তখন নিশ্চয়ই থানা-পুলিশও

thessmyworldofsurprises.blogspot.com

থাকবে।"

"কিন্তু এখান থেকে পাহাড় টপকে তাদের ডেরা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেবে ভুটানের রাজধানীর কর্তারা। এখান থেকে থিম্পু যাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রাজাভাতখাওয়া থেকে হাসিমারা হয়ে ফুন্টশলিং যেতে ঘন্টা আড়াই লাগবে। ফুন্টশলিং থেকে গাড়িতে থিম্পু অন্তত সাত-আট ঘন্টা। এখন রওনা হলে মাঝরাত হয়ে যাবে পৌঁছতে।" অমল সোম বললেন।

"তা হলেও তো তিনদিন হাতে থাকবে।"

"আমাদের কথায় ওরা কান দিতে না-ও পারে। একমাত্র আমেরিকান কনসুলেট চাইলে ওঁরা ভুটানের স্বরাষ্ট্র দফতরকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করতে পারেন।"

অর্জুন ঘরের ভিতরে চলে এল। মাঝখানের যে ঘরে ভানুপ্রসাদ প্রথম রাত্রে ঘুমিয়েছিল, সেখানে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল বাদল।

অর্জুন তার পাশে বসে বলল, "লছমন বলত রাত্রে জঙ্গলে ঢোকা বিপজ্জনক, কিন্তু নিজেই ওই ভুলটা করল!"

"বহুদিন ধরে ওকে চিনতাম। আমাকে তো ও একসময় সাহায্য করেছিল। ও যদি আমাকে চাল-আলু না জোগান দিত, তা হলে আমি না খেয়ে মরে যেতাম। ও যে আমার কাছে ওদের নিয়ে গিয়েছিল সেটা একদম বাধ্য হয়ে। ওর যে এভাবে মৃত্যু হবে তা আমি কল্পনাও করিনি বাবু। আমি যদি ওর সঙ্গে যেতাম তা হলে এরকম হত না। আমি ওকে নিয়ে বড় রাস্তা দিয়েই যেতাম।" বাদল বলল।

"বাদল, তুমি তো অনেকদিন ওই দলের সঙ্গে ছিলে?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"ওরা এখন কোথায় ক্যাম্প করেছে আন্দাজ করতে পার।"

"অনেক জায়গা আছে। বিজয়চাঁদ বাবুকে যেখানে রেখেছিল, সেখান থেকে সরে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। ঠিক কোন জায়গায় তা কী করে বলব?"

অর্জুন একটু ভাবল। তারপর চুপচাপ উঠে বারান্দায় চলে এল। লোক দু'টো উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। দ্বিতীয় লোকটিকে সোজা করল সে। লোকটা চোখ পিটপিট করল। এই লোকটার মন দুর্বল হয়েছে। এভাবে পালিয়ে বেড়াতে ওর ভাল লাগছে না। লোকটাকে কাজে লাগানো দরকার। সে বাঁধা থাকা অবস্থাতেই লোকটাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। লোকটা অবাক হল। ওর মুখে কাপড় ঠাসা। সেই অবস্থাতেই প্রায় কোলে করে ওকে নিয়ে ভিতরে এল অর্জুন। সোফায় বসিয়ে দিতেই লোকটার চোখ পড়ল বাদলের উপর। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফারিত হল তার চোখ।

অর্জুন ওর মুখ থেকে গুঁজে রাখা কাপড় বের করতেই লোকটা ঢোক গিলল। অর্জুন বলল, "তোমরা ওকে মারতে এসেছিলে?"

কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না লোকটা। অর্জুন একগ্লাস জল ওর মুখের সামনে ধরতে ও ঢকঢক করে কিছুটা জল গিলে ফেলল। প্রথম কথা বলল সে, "তুমি পালাও। তোমাকে ওরা খুঁজছে।"

বাদল কোনও কথা বলল না।

"ওকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো তা হলে তোমারও কোনও ভয় নেই।" অর্জুন হাসল, "তোমাকে দলে ফিরে যেতে হবে না।"

"ওরা ঠিক আমাকে খুঁজে বের করবে।"

"কাল যে মেমসাহেবকে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে?" অর্জুন খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

"ছাঙ্গুবাড়িতে।"

"সেটা কোথায়?"

"নদী পেরিয়ে এক মাইল ভিতরে। ভুটানে।"

"কাল রাত্রে কোনও নেতার সেখানে আসার কথা ছিল?"

"নাম জানি না। সবাই বলে নাম্বার টু। তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল।"

"ক'টা ক্যাম্প আছে ওখানে?"

"সাতটা।"

"তুমি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?"

"না বাবু!"

"কেন?"

"আমি ওখানে কখনও যাইনি।"

"তা হলে তুমি কোথায় ছিলে? কোত্থেকে এসেছ?"

"আমরা নদীর ওপারে ছিলাম। আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ওঁকে খুঁজে বের করতে। আমরা তিনজন ছিলাম। একজনকে কাল ছাঙ্গুবাড়িতে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। যে খবরটা দিয়েছিল তার মুখেই শুনেছি, এক মেমসাহেবকে ওখানে ধরে আনা হয়েছে।"

এই সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ হল। অর্জুন বাইরে বেরিয়ে দেখল, পুলিশের একটা জিপ এবং ভ্যান এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। ও সি এবং চারজন সেপাই নেমে এলেন দু'টো গাড়ি থেকে।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ও সি জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার সোম?"

অমল সোম বললেন, "আমি। বসুন।"

ও সি চেয়ারে বসলেন, "আমরা ডেডবডি পেয়ে গিয়েছি। লোকটার নাম বলুন!"

"লছমন। উপাধি জানি না। এই বাংলোর দরোয়ান ছিল।"

"বাংলোর মালিক ফোন করেছিলেন। উনি শিলিগুড়ি থেকে আসছেন। আপনারা কী করে খবরটা পেলেন?"

"খুঁজতে গিয়েছিল ওকে।"

"বুঝলাম। বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে কীভাবে পৌঁছলেন?"

অর্জুন এগিয়ে এল, "ওখানে একটা সরু হাঁটাপথ নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমরা ভেবেছিলাম, লছমন ওখান দিয়ে শর্টকাট করতে পারে।"

"আপনি?"

"আমি অর্জুন।"

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ও সি। নমস্কার করে বললেন, "আচ্ছা! আপনার কথা আমি খুব শুনেছি।"

মেজর গম্ভীর গলায় বললেন, "মিস্টার সোম অর্জুনের গুরু।"

"ও হ্যাঁ।" তারপরেই প্রসঙ্গ পালটালেন, "এস পি সাহেব বলেছেন, দু'জন উগ্রপন্থীকে আপনারা এখানে আটকে রেখেছেন। তারা কোথায়?"

অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকাল। অমল সোম বললেন, "ওরা এখানেই আছে।"

"আমরা ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।"

অমল সোম বললেন, "আমি এস পি এবং ডি এফ ও-কে বলেছি, আমাদের সঙ্গে গবেষণার কাজে আসা একটি আমেরিকান মেয়েকে উগ্রপন্থীরা কিডন্যাপ করেছে। এস পি নিশ্চয়ই তার কথা আপনাকে জানিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওরা কাউকে কিডন্যাপ করলে ভুটানে নিয়ে যায়। সেখানে অনুমতি ছাড়া ভারতীয় পুলিশ ঢুকতে পারে না।"

"তার মানে আপনি বা আপনারা স্টেফিকে উদ্ধার করতে পারবেন না?"

"যদি ওরা ওঁকে বর্ডার পেরিয়ে এদিকে নিয়ে আসে...!"

"যদি না নিয়ে আসে?"

"বুঝতেই পারছেন, আমাদের হাত-পা বাঁধা।"

"তা হলে এই দু'জনকে জিজ্ঞেস করে স্টেফির উপকার করতে পারবেন না?"

"আমরা অন্য তথ্য পেতে পারি। ওদের যাবতীয় সাপ্লাই ভারত থেকে যায়। এর আগে ধরপাকড় হওয়ার পর ওরা পদ্ধতি বদলেছে। সেটা কী জানতে পারলে ওরা ওখানে বিপাকে পড়বে। সেক্ষেত্রে ওরা বর্ডার পেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।"

"অফিসার, আপনি যা বলা উচিত তাই বলছেন, কিন্তু আমাদের হাতে আর তিনটে দিন আছে। আপনার উপর ভরসা করে অনন্তকাল

অপেক্ষা করলে স্টেফিকে হয়তো কোনওদিন দেখতে পাব না।" অমল সোম বললেন।

অর্জুন বলল, "আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব।"

"বলুন।"

"একজন উগ্রপন্থী, যে মুখ খুলছে না, তাকে আপনি নিয়ে যান।"

"দ্বিতীয়জন?" ও সি জিজ্ঞেস করলেন।

"দ্বিতীয়জনকে এখনও আমাদের দরকার হবে। তাকে আমরাই আপনার থানায় পৌঁছে দেব, কথা দিচ্ছি।"

"দরকার হবে মানে?"

"আপনাদের পক্ষে যখন ভুটানে গিয়ে স্টেফিকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তখন আমরাই চেষ্টা করে দেখি। দ্বিতীয় লোকটার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়।"

"এ কী বলছেন! ওরা আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে। ওদের কাছে খালি হাতে আপনারা কী করতে পারবেন?"

"না পারলে যা হবে, এখানে হাতগুটিয়ে বসে থাকলেও তাই হবে।"

"আমি এ ব্যাপারে আপনাদের সমর্থন করছি না। যা করবেন তা নিজেদের দায়িত্বে করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?"

"দেখাই যাক।" অর্জুন হাসল।

বারান্দা থেকে বন্দি করে রাখা লোকটিকে সেপাইরা তুলে নিয়ে এলে ও সি বিদায় নিলেন। মেজর এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। ওভাবে থাকতে তাঁর বোধ হয় খুব পরিশ্রম হচ্ছিল। ও সি চলে যেতেই ফেটে পড়লেন মেজর, "কিল মারার গোঁসাই! পটকোচিয়াম!"

অর্জুন হেসে ফেলল, "শব্দটার মানে কী?"

মেজর বললেন, "আহাম্মক। ব্রংকসের হিসপ্যাথিজদের ভদ্র গালাগাল।"

অর্জুন ভানুপ্রসাদকে বলল, "বাদলকে ডেকে আনো।"

বাদল এল মাথা নিচু করে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাদের ছাঙ্গুবাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে? গিয়েছ কখনও?"

"এক ক্যাম্পের লোককে অন্য ক্যাম্পে যেতে দেওয়া হয় না। তবে আমি অনুমান করতে পারছি জায়গাটা কোথায়?"

"তুমি ওই লোকটির সঙ্গে ভাব জমাও। জিজ্ঞেস করো, কত লোক ওই ছাঙ্গুবাড়িতে আছে? কীভাবে সেখানে পৌঁছে আমরা মেমসাহেবকে উদ্ধার করতে পারি?" অর্জুন নিচু গলায় পরামর্শ দিল।

"ঠিক আছে।"

ওকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে অর্জুন অমল সোমকে বলল, "চলুন, একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবে?"

"জয়ন্তীর কাছে এই নদী গাড়িতে চেপেই পার হওয়া যায়। ওখানে জল খুব কম। দু'পাশ দিয়ে দু'টো ধারা আছে। নদী পেরিয়ে কিছুটা গেলে একটা মন্দির পাওয়া যাবে। স্থানীয় লোকরা ওই মন্দিরের দেবীকে খুব জাগ্রত বলে মনে করে। গাড়ি ওই পাহাড়ে উঠতে পারে।" অর্জুন বলল।

"মন্দির?" মেজর বিড়বিড় করলেন, "আমি মন্দির-ফন্দির কোথাও যাচ্ছি না।"

অমল সোম বললেন, "তা হলে আপনি এই ফোর্ট আগলান। আমরা ঘুরে আসছি।"

ভানুপ্রসাদ জঙ্গলের রাস্তা ধরে জয়ন্তী-রাজাভাতখাওয়া রোডে চলে এল বেশ দ্রুতগতিতে। জয়ন্তীতে পৌঁছে খোঁজখবর নিতে একটা লোক জুটে গেল! লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দালাল-দালাল ভাব। বলল, "পুজো দেবেন? কোনও চিন্তা নেই। আমি মন্দিরের বন্ধ দরজা খুলিয়ে পুজোর ব্যবস্থা করে দেব। মাই নেম ইজ ওয়াংচু।"

অমল সোম বললেন, "ওয়াংচু? তুমি তো বাঙালি?"

"নো স্যার। বাংলায় কথা বলি। বাট মাই ফাদার ওয়াজ ভুটানি।"

"দক্ষিণা কত?"

"স্যার। মুরগি আর খাসির মাংসের ডিফারেন্স নিশ্চয়ই আপনার জানা। কী আর বলব।"

অর্জুন বলল, "চলুক ও। কী বলেন?"

অমল সোম মাথা নাড়লেন। ওয়াংচু উঠে বসল পিছনে। তারপর তারই নির্দেশমতো গাড়ি চালিয়ে নদী পার হলেন ওঁরা। এখন নদীর বুকে জল নেই কিন্তু গোটা পনেরো লরি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে বোল্ডার বোঝাই করছে শ্রমিকরা।

অর্জুন বলল, "এখানে জল নেই অথচ নীচে হাঁটুজলে ভাল স্রোত রয়েছে। কীভাবে?"

"নো প্রবলেম স্যার। দু'টো ধারা এক হয়ে গিয়ে হাঁটুজল হয়েছে। তার মানে মাটি ভেদ করে ওঠা স্প্রিং-এর জল মিশেছে। এবার আমরা ইন্ডিয়া পার হয়ে ভুটানে পৌঁছলাম স্যার।" ওয়াংচু যোগ করল, "মাই ফাদারল্যান্ড।"

"তোমার মাদারল্যান্ড নয়?" অমল সোম হাসলেন।

"নো। মাই মাদার ওয়াজ ইন্ডিয়ান। বাঁ-দিকে ভাই।" শেষটা ভানুপ্রসাদকে বলল।

অর্জুন ভুটান এবং ভারতের প্রকৃতিতে কোনও ফারাক দেখতে পাচ্ছিল না। পাহাড়ি রাস্তা ধরে গাড়ি উঠে যাচ্ছিল উপরে। মিনিট পনেরো যাওয়ার পর মন্দিরটাকে দেখা গেল। গাড়ি থামতে ওয়াংচু নেমে পড়ল আগে। অমল সোম বললেন, "চলো, মন্দিরের ভিতরটা দেখে আসি।"

অর্জুন বলল, "আমি কিন্তু...।"

তাকে থামিয়ে দিয়ে অমল সোম বললেন "জানি।"

ওয়াংচু তাঁদের জুতো খুলিয়ে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেল। একজন ভুটানি পুরোহিত জানিয়ে দিলেন, "এখন মায়ের ভোগের সময়। ভোগ শেষ হলে বিশ্রাম নেবেন। দর্শন পাওয়া যাবে বিকেল চারটে থেকে।"

ওয়াংচু অনেক চেষ্টা করেও ওঁর মন ভেজাতে পারল না। এই সময় দু'টো গাড়ি উপর থেকে দ্রুত নেমে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ও দু'টো পুলিশের গাড়ি কিন্তু 'পুলিশ' শব্দ কোথাও লেখা নেই। একজন ভারিক্কি গোছের লোক, বোঝাই যাচ্ছে বড় অফিসার, এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেলেন। তাঁদের একই কথা বললেন পুরোহিত। ভদ্রলোক ঘড়ি দেখে বললেন, "ব্যাড লাক!"

ওয়াংচু সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ স্যার, ব্যাড লাক। এঁরাও এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে। দেখতে পাচ্ছেন না।"

অর্জুন এগিয়ে গেল। ইংরেজিতে বলল, "আমি অর্জুন। একজন সত্যসন্ধানী। ইনি আমার গুরু অমল সোম।"

ভদ্রলোক দু'জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, "সত্যসন্ধানী? কোন ফিল্ডে?"

অর্জুন হাসল, "যে-কোনও ফিল্ডে, যেখানে সত্যকে মিথ্যে দিয়ে আড়াল করা হয়।"

"ইন্টারেস্টিং! তার মানে আপনারা ডিটেকটিভ?"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "ডিটেকটিভ শব্দটায় আপত্তি আছে।"

"ও। আপনারা চলুন, আমার সঙ্গে চা খেয়ে যাবেন। চারটের আগে তো মন্দির খুলবে না। আমি এখানে নতুন। কিন্তু আমার টেন্টে ভাল চা আছে।" অফিসার বললেন।

অর্জুনের ইচ্ছে ছিল না কিন্তু অমল সোম বললেন, "এ তো আমাদের সৌভাগ্য।"

ঠিক হল ভানুপ্রসাদ গাড়ি নিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করবে।

টেন্টে পৌঁছতে পঁচিশ মিনিট লাগল। পাহাড়ের অনেকটা উপরে চলে এসেছেন ওঁরা। এখান থেকে শুকনো জয়ন্তী নদী এবং ওপারের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। গরম একটুও নেই। বোঝাই যায় বিকেল থেকে ভাল ঠান্ডা পড়ে।

টেন্টের বাইরে চেয়ার পেতে দেওয়া হলে অফিসার ওঁদের বসতে

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

বলে চায়ের অর্ডার করলেন। ওঁরা জলপাইগুড়িতে থাকেন শুনে অফিসার বললেন, "আমি একবার ফুন্টশলিং থেকে বাগডোগরা হয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম সরকারি কাজে। কখনও জলপাইগুড়িতে যাইনি। আপনারা থিম্পু বা পারো গিয়েছেন?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। যাওয়া হয়নি।"

"একবার ঘুরে আসুন। এত ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য কম জায়গায় দেখতে পাবেন। এখনও ভিসা-পাসপোর্ট লাগে না। আইডেন্টিটি কার্ড হলেই হয়ে যায়।"

চা এল। কাপে চুমুক দিয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা এদিকে কেন এসেছেন? বেড়াতে, না কোনও সত্যসন্ধান করতে?"

"বেড়াতেই এসেছিলাম।" অমল সোম সম্ভবত এই প্রসঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, "আমাদের সঙ্গে একজন আমেরিকান গবেষক ছিলেন। মহিলা একটা গাছের পাতার খোঁজে এসেছিলেন, যা এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।"

"কী করবেন ওই পাতা দিয়ে?"

"শরীরে সামান্য কেটে গেলে ওই পাতার রস লাগালে জুড়ে যায়। স্টেফির ধারণা, ঠিক মতো ব্যবহার করলে আরও বড় ক্ষত জুড়তে পারে।"

"ইন্টারেস্টিং!"

"মুশকিল হল, কাল সন্ধে থেকে স্টেফিকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে কী? কেন?"

"আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, ও জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। পরে জানতে পারলাম, ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।"

"কীভাবে জানলেন?"

"কিডন্যাপাররা ইন্ডিয়ান পুলিশকে জানিয়েছে কত টাকা তারা চায়।"

"অ্যাঁ!" অফিসার সোজা হয়ে বসলেন।

"ভারতীয় পুলিশ অসহায়। কারণ, ওরা ভুটানের জমিতে ক্যাম্প করে আছে।" অর্জুন বলল, "বর্ডার পেরিয়ে ভারতীয় পুলিশের আসা বেআইনি কাজ হবে।"

অফিসার একটু ভাবলেন, "সমস্যা আমি বুঝতে পারছি। আমাদের দেশের মাটিকে এরকম অন্যায় কাজে কেউ ব্যবহার করুক তা আমরা চাই না। সমস্যা হল, এখানকার সব খবর থিম্পুতে পৌঁছয় না। ঠিক কোন জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছে?"

"সম্ভবত ছাঙ্গুবাড়ি নামে একটা জায়গায়।"

"ছাঙ্গুবাড়ি? সেখানে তো লোকবসতি নেই। গভীর জঙ্গল। দেশের ভিতর থেকে ওখানে পৌঁছবার কোনও রাস্তা নেই। বর্ডার থেকে পায়েচলা পথ থাকতে পারে।"

"সবক'টা ক্যাম্প ওখানেই?"

"বোধ হয় না। স্টেফিকে ওই ক্যাম্পে কাল সন্ধের পরে দেখা গিয়েছে।"

অফিসার বললেন, "দেখুন, আপনাদের কথা শুনে আমি রাজধানীতে ঘটনাটা জানালে ওদের সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে। অথচ আমার উপর অর্ডার আছে কাল সকালেই এখান থেকে পারো যাওয়ার জন্যে। আমার এখানে যে ফোর্স আছে তাদের আমি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারি না। আবার আপনাদের দেশের পুলিশও বর্ডার পার হতে পারবে না। লেটস টেক এ চান্স!" একটু ঝুঁকে নিচু গলায় অফিসার কথা বলতে লাগলেন।

অফিসারের পরামর্শমতো ওঁরা ফিরে এলেন নদী পেরিয়ে। ভারত থেকে নদীর এপারে কত গাড়ি আসছে এবং তাদের ক'টা ফিরছে তার হিসেব নিশ্চয়ই উগ্রপন্থীরা জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে করছে। আক্রান্ত

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

হওয়ার আশঙ্কায় এটা করতে বাধ্য ওরা।

বাংলোয় যখন ফিরে এলেন তখন বিকেল চারটে। গেটের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওঁদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে মেজরের সঙ্গে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন বাংলোর বারান্দায়। বেশ ফরসা, মধ্য যাটের মানুষটির মাথার অনেকটাই চকচকে টাক।

অমল সোমকে নামতে দেখে তিনি উপর থেকেই হাতজোড় করলেন, "আপনার ফোন পেয়ে ছুটে এলাম। আমি সুধাংশু।"

"চিনতে পেরেছি।" অমল সোম বললেন, "খুব খারাপ লাগছে। লছমন যে কেন এখান থেকে পালাতে গেল!"

"ও বেশ কিছুদিন ধরেই আমাকে বলছিল এখানে থাকতে চায় না। এরকম জায়গায় কোনও লোক চাকরি করতে আসতে চায় না। তাই ওকে বলেছিলাম, বদলি পেলে সরিয়ে নিয়ে যাব শিলিগুড়িতে। সমস্যাটা আমারই বেড়ে গেল।"

"পোস্টমর্টেম কবে হবে?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"সদরে পাঠানো হচ্ছে ডেডবডি। হাতিই ওকে মেরেছে। আপনারা এখানে কতদিন থাকতে চান?" সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন সুধাংশু।

"আমরা একজনের অপেক্ষায় আছি। সে এলেই ফিরে যাব।"

"একটা অনুরোধ করব? যাওয়ার সময় সব দরজায় তালা দিয়ে যাবেন। চাবি আমার শিলিগুড়ির অফিসে পৌঁছে দিতে যদি অসুবিধে হয়, তা হলে লোকাল থানার ও সি'র কাছে রেখে যাবেন। আমার বাংলোয় এসেছেন অথচ আপনাদের সেবাযত্ন করতে পারছি না বলে খারাপ লাগছে। আচ্ছা, নমস্কার।" সুধাংশু চলে গেলেন।

দ্বিতীয় লোকটিকে রেখে কোনও কাজ হল না। সে কিছুতেই ওদিকে যেতে রাজি হল না। তার ভয়, দেখতে পেলেই ওরা তাকে মেরে ফেলবে।

অতএব বাদলকে নিয়ে বসলেন অমল সোম। বাদল যে-কোনও কারণেই হোক, এতদিন উগ্রপন্থীদের দলে ছিল। ওর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই পুলিশ অনেক অভিযোগ করতে পারবে। ধরা পড়লে আবার জেলে যেতে হবে তাকে, অন্তত সাত-আট বছরের জন্যে। এক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল, মেমসাহেবকে উদ্ধার করতে সাহায্য করা। এরকম ভাল কাজ করলে তিনি পুলিশকে অনুরোধ করবেন ওর বিরুদ্ধে কোনও মামলা না আনতে।

বাদল মাথা নাড়ল, "ওরা খুব ভয়ংকর লোক। সঙ্গে এ কে ফর্টি সেভেন আছে। খালি হাতে কী করে ওদের সঙ্গে লড়াই করবেন?"

"সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি রাতের অন্ধকারে ওদের চোখ এড়িয়ে আমাদের ছাঙ্গুবাড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। পারবে?"

মাথা নাড়ল বাদল। পারবে।

অর্জুন ওর সঙ্গে বসল। জয়ন্তী থেকে আধমাইল উপরে গিয়ে নদী পেরিয়ে ভুটানে যেতে হবে। নদী পার হতে কুড়ি মিনিট লাগবে। তারপর একটা কাগজে ম্যাপ এঁকে সে বুঝিয়ে দিল ছাঙ্গুবাড়িটা কোথায়।

সন্ধের পরে ওঁরা বের হলেন। দ্বিতীয় লোকটার পায়ের দড়ি খুলে দেওয়া হয়েছিল। তাকে থানায় নামিয়ে দেওয়া হল। ও সি অবাক হলেন, "এত তাড়াতাড়ি ওকে দিয়ে কী করালেন?"

"করানো গেল না বলে আপনার হেপাজতে দিয়ে গেলাম।" অর্জুন বলল, "একটা কথা, যে-কোনও ভারতীয় বেড়াতে বা ধর্মকর্ম করতে ভুটানে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি নেই বলে জানি। ঠিক কিনা?"

"কোনও আপত্তি নেই। দু'-দেশের মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসা এখনও চালু হয়নি।"

জয়ন্তী ছাড়িয়ে ওরা যেখানে পৌঁছল সেখানেই পথের শেষ। এখন চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অমল সোম বললেন, "মিনিটদশেক গাড়িতেই বসে থাকা যাক। কেউ আলো জ্বালাবেন না। গাড়ির হেডলাইট নদীর ওপার থেকেও দেখা যাবে। যদি কেউ লক্ষ করে, তা হলে তাকে বিভ্রান্ত করা দরকার।"

রাত দশটায় ওঁরা নদীর নুড়িতে পা দিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মেজর থমকে দাঁড়ালেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"স্নেক!" ফিসফিস করলেন মেজর।

"কোথায়?"

"আমার জুতোর নীচে। এনি মোমেন্ট ছোবল মারবে।"

অন্ধকারে মেজরের পা দেখা যাচ্ছে না। অমল সোম বললেন, "আপনি লাফিয়ে সামনে চলে আসুন।"

মেজর লাফ দিলেন। তাঁর বিশাল শরীরটা পাথরের উপর আছড়ে পড়তে তিনি আর্তনাদ করেই চুপ করে গিয়ে বললেন, "সরি!"

"উঠুন।" অর্জুন বলল।

"ইম্পসিবল্। আমার পা ভেঙে গিয়েছে। উঃ!" মেজর কাতরালেন।

অর্জুন ওঁকে টেনে তুলতেই তিনি বললেন, "এজিং। বয়স হচ্ছে। আমি এখন হেঁটে যেতে পারব না। তোমাদের বোঝা বাড়াবার কোনও মানে হয় না। আমি বরং গাড়িতে ফিরে যাই।" মেজর পিছন ফিরলেন।

"যেতে পারবেন? পা ভেঙে গিয়েছে বলছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"খঞ্জও পাহাড় ডিঙোয়। আই উইল ওয়েট ফর ইউ।"

মেজর ফিরে গেলে ওঁরা নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। ঘণ্টাখানেক পরে অর্জুন দেখতে পেল, পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো পরপর তিনবার জ্বলে নিভে গেল। ওটা যে টর্চের আলো তা বুঝতে অসুবিধে হল না। অফিসারের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল, উনি টর্চের আলো জ্বেলে সংকেত পাঠাবেন। সেইদিকে এগোতে বাদল বলল, "ওদিকে না, এদিক দিয়ে যেতে হবে।"

"কেন?"

"ছাঙ্গুবাড়ি ক্যাম্প এদিকে।"

"সরাসরি না গিয়ে আমরা একটু ঘুরে যেতে চাই।"

প্রায় চল্লিশ মিনিট পাহাড়ে ওঠার পর অমল সোম পকেট থেকে টর্চ বের করে পরপর তিনবার আলো জ্বালিয়ে নেভালেন। কোথাও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

অর্জুন একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে ছিল। অন্ধকার একটু-একটু করে পাতলা হচ্ছে। এই সময় মানুষের গলা পাওয়া গেল। দু'টো লোক কথা বলতে-বলতে যাচ্ছে। একজন খুব উত্তেজিত। ওরা যে ভাষায় কথা বলছে তা বোধগম্য হল না অর্জুনের। লোক দু'টো দূরে চলে গেলে বাদল এসে দাঁড়াল পাশে, "ওর খবর দিয়ে গিয়েছে। সাহেব, ওদের একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে থানায়। এই খবরটা ক্যাম্পে দিতে যাচ্ছে এরা। নিশ্চয়ই নদী পার হয়ে এল।"

"ক্যাম্পে কারও মোবাইল ফোন নেই?"

"এখানে ইন্ডিয়ার টাওয়ার কাজ করে না।"

অমল সোম আবার টর্চ জ্বালিয়ে সংকেত পাঠাতেই খুব কাছ থেকে গলা ভেসে এল, "ওকে! উই আর হিয়ার।"

ভুটানের অফিসার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর পিছনে আরও তিনজন, কিন্তু তাঁদের পরনে সাদা পোশাক। বাদলকে দেখে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে?"

অমল সোম বললেন, "এই লোকটির নাম বাদল। ও ক্যাম্পটা চেনে।"

অফিসার বাদলকে জিজ্ঞেস করলেন, "ক্যাম্পে কত লোক আছে?"

"বারো-তেরোজন থাকে। এখন কত আছে জানি না।"

"অস্ত্র আছে নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ সাহেব। এ কে ফর্টি সেভেন আছে।"

অফিসার অমল সোমকে বললেন, "আমরা একটু অপেক্ষা করব। আরও রাত বাড়ুক। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক। না হলে দশ-বারোজনের সঙ্গে আমরা লড়াই করে জিততে পারব না। চলুন, আর-

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

একটু এগিয়ে যাওয়া যাক।"

বাদল ওঁদের পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল। এখন অন্ধকার আরও পাতলা হয়ে গিয়েছে।

খানিক পরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালেই ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। ওঁরা যতটা সম্ভব গাছ এবং পাথরের আড়াল নিলেন।

বাদল নিচু গলায় বলল, "ওই নিচু জায়গায় গাছের আড়ালে ক্যাম্প।"

ক্যাম্পে কোনও আলো জ্বলছে না। জ্বললে গাছের ফাঁক দিয়ে তা দেখা যেত। মাঝে-মাঝে হুইস্‌লের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনটে নাগাদ অফিসার বললেন, "নাউ অ্যাকশন নেওয়ার সময় হয়েছে। আপনারা চারধারে নজর রাখুন।"

তারপরেই কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা কিছু বের করে তাতে চাপ দিয়ে সজোরে ক্যাম্পের দিকে ছুড়লেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পরে প্রচণ্ড শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার ছুড়েছেন অফিসার। এবার আরও ওপাশে। শব্দ হল প্রচণ্ড, সেইসঙ্গে আগুনের ঝলকানি। তৎক্ষণাৎ চিৎকার শুরু হল। ক্যাম্পের লোকজন ভয়ে চিৎকার করে চলেছে সমানে। কেউ একজন তাদের ধমকে থামাতে চাইছে। হঠাৎ যেদিকে বোমা ফেটেছিল সেদিক লক্ষ করে গুলি চালাতে লাগল কেউ-কেউ। অর্জুন দেখল, অফিসার গ্রেনেড ছুড়লেন ক্যাম্পের নীচ লক্ষ করে। একজন চেঁচিয়ে বলল, "শেল্টার নাও। ক্যাম্প ছেড়ে তিন নম্বরে চলে যাও সবাই। কুইক। ভুটানি পুলিশ অ্যাটাক করছে।"

তারপরেই মেয়েলি গলায় চিৎকার ভেসে এল। ওটা যে স্টেফির গলা তা বুঝতে পারছিল অর্জুন। স্টেফিকে জোর করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু তিনি যেতে চাইছেন না। ঝোপঝাড় ভেঙে লোকজন ছুটছে ওপাশে।

অফিসার বললেন, "লেট্‌স গো।"

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অর্জুন অফিসারের সঙ্গে দৌড়তে লাগল। দু'মিনিট পরেই দৃশ্যটা দেখতে পেলেন ওরা। স্টেফিকে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে তিনজন লোক। একজন স্টেফিকে চড় মারল। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ওরা জায়গাটা ছাড়তে চাইছিল। স্টেফির আপত্তিতে তাতে বাধা পড়ছিল। অফিসার তৃতীয় ব্যক্তির পা লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই সে আর্তনাদ করে পড়ে গেল। যে দু'জন স্টেফিকে ধরে টানছিল তারা ওকে পিঠে তুলতে চাইল। ততক্ষণে অর্জুন আর অফিসার পৌঁছে গিয়েছেন ওদের পিছনে। ভয় পেয়ে ওরা স্টেফিকে নামিয়ে দিতেই স্টেফি দৌড়লেন পিছনে। লোক দু'টোকে ধরে ফেলল অফিসারের লোক। অমল সোম চিৎকার করে ডাকলেন, "স্টেফি! কুইক!"

স্টেফিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। অর্জুন তাঁকে খুঁজতে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলি ছুটে আসতে অর্জুন লাফিয়ে আড়ালে চলে যেতে-যেতে বুঝল, অল্পের জন্য বেঁচে গেল এখন। কিন্তু যে লোকটা তখনও ক্যাম্পে থেকে গিয়ে অর্জুনের উদ্দেশে গুলি ছুড়ছিল, সে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। অর্জুন দেখল, তার মাথায় একবার লাঠির আঘাত করেই সন্তুষ্ট হয়নি, তারপর কয়েকবার লাঠি চালাল। অর্জুন চিৎকার করল, "স্টেফি! কুইক চলে এসো।"

"নো। এক মিনিট।"

ততক্ষণে অমল সোম এবং অফিসার চলে এসেছেন ভিতরে। অফিসার বললেন, "মাই গড! ওরা তো রীতিমতো আর্মি ক্যাম্প তৈরি করে ফেলেছিল এখানে।"

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেফি দেরি করছে কেন?"

অর্জুন চিৎকার করল, "স্টেফি!"

এবার স্টেফি বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটা বড় থলে।

অমল সোম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী আছে ওতে?"

"ও মিস্টার সোম! আমি পেয়েছি। একদম গাঢ় রঙের পাতা। রিয়েল বিশল্যকরণী পাতা। কাল সারাদিন ধরে এখানে কুড়িয়েছি।"

"ভগবান!" অমল সোম বললেন।

ওঁরা ফিরতে গিয়ে অমল সোম দাঁড়িয়ে পড়লেন। দৌড়ে গেলেন চিত হয়ে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহের দিকে। হাত বাড়িয়ে চোখের পাতা বন্ধ করে দিলেন তিনি। অর্জুন দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিল। গলার পাশে আঙুল চেপে মাথা নাড়ল সে। প্রাণ নেই। কখন মারা গেল বাদল?

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "সেই লোকটি না?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ।"

"ওর বডি আপনারা নিয়ে যেতে চান?"

"কোথায় নিয়ে যাব? ওর কেউ কোথাও আছে কিনা জানি না।" অমল সোম বললেন, "এখানে নিশ্চয়ই আপনাদের পুলিশ আসবে?"

"আসা উচিত।" অফিসার ঘড়ি দেখলেন, "এবার আমাদের চলে যাওয়া উচিত। ভোর হতে দেরি নেই। আমাকে পারো যেতে হবে এখনই। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি অফিসিয়ালি এখানে আসিনি। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি যে কারণে এসেছিলাম তা তাঁর সাহায্যে সম্ভব হয়েছে।" সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তিনি।

স্টেফিকে নিয়ে ওঁরা নদী পেরিয়ে যখন গাড়ির সামনে পৌঁছলেন তখন সূর্য উঠেছে। দূর থেকে স্টেফিকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দু'হাত তুলে চিৎকার করছিলেন মেজর। দৌড়ে ওঁর কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন স্টেফি, "আমি পেয়ে গিয়েছি। একদম ঠিকঠাক বিশল্যকরণী!"

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে অমল সোম বললেন, "কিডন্যাপড হয়েছিল, ওরা ওকে মেরেও ফেলতে পারত! কিন্তু সে সব ভুলে মেয়েটা গবেষণার পথে এগিয়ে যাওয়ার রসদ পেয়ে আনন্দে বুঁদ হয়ে আছে। তুমি একে কী বলবে অর্জুন?"

"পাগল মাত্রই জিনিয়াস নয়। কিন্তু জিনিয়াসরা পাগল হয়।" অর্জুন হাসল।

thismyworldofsurprises.blogspot.com